টেনাগড়ে টেনশন

বুদ্ধদেব গুহ

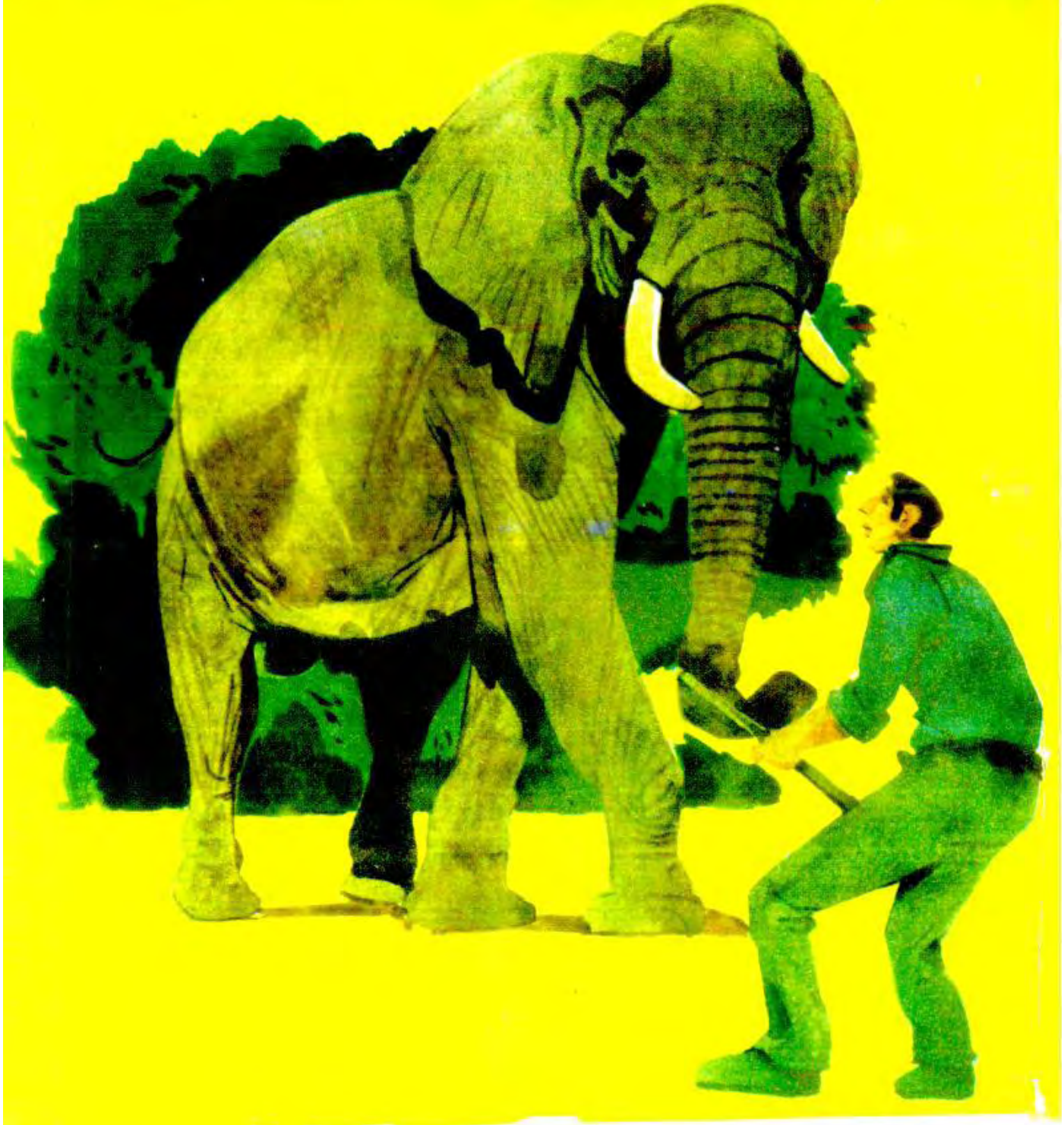

টেনাগড়ে টেনশন

বুদ্ধদেব গুহ

ছোটদের কচিপাতা
৩৪, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

ভূমিকা

ছোটদের অনেক গল্পই লিখেছি তবে যত্নের অভাবে তার মধ্যে বেশিই হারিয়ে গেছে।

কচিপাতার সম্পাদক সমর পাল অনেক পুরনো পত্র-পত্রিকা ঘেঁটে কিছু গল্প উদ্ধার করে এই সংকলনটি প্রকাশ করছেন।

আশা করি এই সংকলনটি ছোটদের ভাল লাগবে।

(বুদ্ধদেব গুহ)

২৭/১১/২০০৬

সূচিপত্র

টেনাগড়ে টেনশন ৭
দাঁতের বদলে দাঁত ১৬
ধুধুগাওয়ার পুনুয়া ২২
আলোকঝারির চিতাবাঘ ২৮
আমি ৩৩
গাড্ডী লাজোয়াব ৪২
দুর্গাদের কথা ৪৯
প্যাঁকাও ৫৪
অখ্যাত শিকারি ৬১
ম্যাথস ৬৫
কাড়ুয়া ৮৬
যমদুয়ারের ছোকরা বাঘ ৯০
দীনবন্ধু ও বাঘডুম্বা ৯৫
ফাদার-মাদার কো দোয়া ৯৯

টেনাগড়ে টেনশন

খগা সরকার আর ভগা সরকারকে চিনত না এমন লোক টেনাগড়ে কেউ ছিল না। পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা ছোট্ট শহর এই টেনাগড়। এখানে সকলেই সকলকে চেনে।

খগাদার বয়স হয়েছে ষাট-টাট। শৌখিন লোক। যৌবনে বেহালা বাজাতেন, শিকার করতেন, ওকালতিও। পিতৃপুরুষের সম্পত্তি ছিল বিহারের নানা জায়গায়। তাই 'খেটে খেয়ে' তিনি জনগণের সামিল হতে চাননি। কিন্তু প্রয়োজন না থাকলেও খাটতে তিনি ভালোবাসতেন এবং পরিশ্রমে বিশ্বাস করতেন।

খগাদার ভাই ভগাদার বয়স তিরিশ-টিরিশ হবে। টেনাগড়ে তিনি প্রায়ই নানা ধরনের খবরের সৃষ্টি করে থাকেন। লোকটি ভালো।

খগাদা এখন রিটায়ার্ড। ইদানীং চটের উপরে গুনছুঁচে রঙিন সুতো পরিয়ে 'সদা সত্য কথা বলিবে', 'ভগবান ভরসা', 'যাকে রাখো সেই রাখে' ইত্যাদি লিখে লিখে বস্তির লোকেদের সেগুলো দান করেন। মাঝে মাঝে কাহার-বস্তির অনিচ্ছুক শুয়োরগুলোকে ধরে এনে কুয়োতলায় তাদের জবরদস্তি সাবান মাখান। সন্ধেবেলায় ওঁর বাড়িতে ভজন গান হয়। সকালে দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন। খগাদার ডিসপেনসারিতে লোম ওঠা পথের কুকুর, কুঁজে-ঘা হওয়া বলদ এবং হাড্ডিসার মানুষ—সকলেই চিকিৎসার জন্যে আসে এবং আশ্চর্য কেউ কেউ ভালোও হয়ে যায়।

খগাদা মৃতদার। ছেলে-মেয়েও কেউ নেই। ভগাদা বিয়েই করেননি। দুই ভাইয়ের সুন-সান্নাটা সংসার। থাকবার মধ্যে একটা অ্যালসেশিয়ান কুকুর, তার নাম মোহিনী। চাকরবাকর আছে, গাই-বয়েল, খেতি-খামার, খিদ্‌মদ্‌গার। আর আছে বারান্দার দাঁড়ে-বসা একটা কুৎসিত কাকাতুয়া। ভগাদার আদরের পাখি। কুকুরটাও আদরের। কাকাতুয়াটাকে ভগাদা আদর করে ডাকত 'কাকু' বলে। আমরা বলতাম 'কাঁত্তিয়া-পিরেত'। ওদের বাড়ি ঢুকলেই কাকাতুয়াটা বলে উঠত, 'ভাগো হিঁয়াসে', 'ভাগো হিঁয়াসে'।

খগাদা আধুনিক কবিতা, পশুপালন, বাজরা-মকাই, তাইচুং ও আই-আর-এইট ধান, ভগাদার ভবিষ্যৎ ইত্যাদি তাবৎ বিষয় নিয়েই আমাদের সঙ্গে জোর আলোচনা করতেন এবং গলার জোর বাড়ানোর জন্যে তেজপাতা, আদা, এলাচ দেওয়া গোরখ্‌পুরি কায়দায় বানানো চা ও ভৈষালোটনের জঙ্গল থেকে আনানো খাঁটি ঘিয়ে ভাজা সেওই খাওয়াতেন।

সেদিন সকালে খগাদার বসবার ঘরে ঢুকতেই দেখি খগাদার মুখ গম্ভীর থমথমে।

গুনছুঁচ ঢুকে গেছে কি বুড়ো আঙুলে?

বিরু নিজের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল, খুব লেগেছে?

খগাদা বললেন, লেগেছে, তবে আঙুলে নয়, হৃদয়ে।

ঢোক গিলে বললাম, স্ট্রোক! মাইল্ড অ্যাটাক?

খগাদা বললেন, তার চেয়েও মারাত্মক।

আমরা বসে পড়ে সমস্বরে বললাম, কী? তবে কী?

খগাদা বললেন, চুরি।

কোথায়? কোথায়? চোর কোথায়? কী চুরি? বলে আমরা প্রায় চিৎকার করে উঠলাম।

এমন সময় ভগাদাকে দেখা গেল একটা লাল রঙের শর্টস্ পরে কাবুলি জুতো পায়ে, খালি গায়ে কাকাতুয়াটাকে খাওয়াচ্ছেন নিজে হাতে, বারান্দায় এসে।

খগাদা আঙুল দেখিয়ে বললেন, ওই যে কালপ্রিট, ওই দাঁড়িয়ে আছে সশরীরে। সহোদর আমার। সাক্ষাৎ লক্ষ্মণ।

আমাদের খারাপ লাগল, বিশ্বাসও হল না। আপন ভাই কখনো চুরি করতে পারে?

খগাদা কী বলছে বুঝতে না পেরে ভগাদা সাঁ করে বারান্দা ছেড়ে সরে গেল ভিতরে। ধরে থাকা খাঁচাটা হঠাৎ ছেড়ে দেওয়ায় কাকাতুয়ার খাঁচাটা জোরে নড়ে উঠল। কাকাতুয়াটা বলল, কাঁচকলা খা! কাঁচকলা খা! ভগাদাকেই বলল বোধ হয়।

খগাদা আস্তে আস্তে বললেন, গত শনিবার রাতে এ-বাড়িতে যত কাঁসার ও রূপোর বাসন ছিল, সব চুরি করে নিয়ে গেছে চোরে, শুনেছ তোমরা?

বিরু বলল, সে কী? বাড়িতে বন্দুক ছিল না?

আমি বললাম, অত বড়ো অ্যালসেশিয়ান কুকুরও তো ছিল।

ছেল। খগাদা বললেন, ছেল সবই। কিন্তু বন্দুক রাখা ছেল গ্রিজ্ মাখানো অবস্থায় বেহালার বাক্সে। আর কুকুর মজাসে ঘুমোচ্ছিল।

আমরা বোকার মতো বললাম, কুকুর ঘুমোচ্ছিল মানে?

তাহলে আর বললুম কী? খগাদা সখেদে বললেন। তারপর আবার বললেন, যে বাড়িতে কুকুর ঘুমোয়, সে বাড়িতে চুরি হবে না?

এরপর গড়গড়ায় গয়ার তামাকে দুটো টান দিয়ে বললেন, বুঝলেন ভায়ারা, রোজ রাতে পড়াশুনো করি, আর শুনতে পাই বারান্দায় মোহিনীর পায়ের পায়জোড়ের আওয়াজ। মোহিনীকে ভগা পায়জোড় বানিয়ে দিয়েছিল। পা ফেললেই ঝুমুর ঝুমুর করে বাজে। আওয়াজ শুনতে পাই, কিন্তু এগারোটা বাজলেই দেখি আওয়াজ থেমে যায়। একদিন মনে সন্দ হওয়াতে পা টিপে টিপে ভগার ঘরের সামনে গিয়ে দেখি ভগা মশারির মধ্যে অঘোরে ঘুমোচ্ছে, আর মেঝেতে শুয়ে মোহিনীও দিব্যি নাক ডাকাচ্ছে। আমি ডাকলুম, ভগা! তাতে 'কে রে' বলেই ভগা উঠে বসে জানলার ধারে আমায় দেখতে পেয়েই ঘুমন্ত মোহিনীর পেটে মারলে ক্যাঁক করে এক লাথি। ঘুমঘোরে লাথি খেয়ে

মোহিনী তো মারলে বাও-থ্রো।—

বিরু বলল, আর ভগাদা?

ভগাদা? বলে খগাদা বিদ্রূপের হাসি হাসলেন। বললেন, ভগা আবার তক্ষুনি শুয়ে পড়ল।

তারপর বললেন, তোমরাই বলো, এ-বাড়িতে চুরি হবে না তো কোন বাড়িতে হবে?

আমরা সত্যিই বড়ো চিন্তায় পড়লাম খগাদার জন্যে। সরি, ভগাদার জন্যে। আসলে ভগাদা মাঝে মাঝেই আমাদের এবং খগাদাকে ঝামেলায় ফেলতেন।

একদিন কলেজ থেকে বাড়ি ফিরেই শুনলাম, খগাদা আমাদের জরুরি তলব দিয়েছেন।

আমরা দৌড়ে গেলাম। দেখি, খগাদার অবস্থা খুব খারাপ। কোলে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের 'কনকোয়েস্ট অব হ্যাপিনেস' বইখানা আধ-খোলা পড়ে আছে, আর খগাদার চোখের কোণে জল চিক চিক করছে।

বিরু বলল, খগাদা, কী? দুঃখ কীসের?

খগাদা বললেন, আর কী? একমাত্র ভাইটাকে বুঝি হারালাম এবার!

কী, হয়েছে কী? আমি উত্তেজিত হয়ে শুধোলাম।

খগাদা বললেন, ভগা আর ওর বন্ধু গিদাইয়া পদ্মার রাজার বিলে হাঁস মারতে গেছে সেই ভোর চারটেয়—বাড়িতে মশলা বাটতে বলে গেছে। হাঁসের শিক্‌কাবাব বানাবে বলে শিক ঘষামাজা করে রাখতে বলেছে, টক দই, পেঁপে, গরম-মশলা, ভাঙা পিরিচ, সবকিছুর জোগাড় রেখে গেছে। আর দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলল, এখনও তাদের দেখা নেই। নির্ঘাত কোনো অঘটন ঘটেছে। আমার পায়ের গেঁটে বাতটা বেড়েছে কয়েকদিন হল। আজ আবার অমাবস্যা। রোজ রসুন খাই, তবু ব্যথা যায় না। আমি তো চলচ্ছক্তিরহিত। তোমরা বাবা যাও একটু। আমার জিপ গাড়িটা নিয়ে যাও। ভগা গিদাইয়াকে নিয়ে মোটর সাইকেলে করে গেছে।

বিরু বলল, নো-প্রবলেম। আপনি চিন্তা করবেন না, খগাদা। আমরা বন্দোবস্ত করছি। তার আগে আমি চট করে পোষ্ট অফিস থেকে রাজবাড়ির ম্যানেজারকে একটা ফোন করে খবর নিয়ে নিই। তাঁকে আমি চিনি, আমার কাকার বন্ধু।

খগাদা বললেন, ব্যস, ব্যস, তাহলে তো কথাই নেই। এই নাও টাকা

নিয়ে যাও বলেই কোমরের গেঁজ থেকে একটা লাল রঙের নাইলনের মোজা বের করে তার থেকে একটা দশ টাকার নোট দিলেন বিরুকে।

বিরু আমাকে বলল, তুই থাক। খগাদা নিড্‌স্ কোম্পানি।

খগাদা বললেন, বুঝলে ভায়া, আজ কত কথাই মনে পড়ছে। ভগা যখন হাসপাতাল থেকে মায়ের সঙ্গে বাড়ি এল, তখন ওকে দেখতে একেবারে বাচ্চা একটা খরগোশের মতো ছিল। কী গাবলু, গুবলু। তার উপর আবার খিলখিল করে হাসত। আমার চেয়ে কত ছোটো। কিন্তু পড়াশোনা করল না, কিছুই করল না, জীবনটাকে নষ্ট করল পাখি আর কুকুর নিয়ে। আমিই এখন ওর মা, ওর বাবা, ওর দাদা, সব। কী বিপদ হল কে জানে। বিলে কি ডুবে মরল নাকি সাপে কামড়াল?

একটু পর ক্রিং ক্রিং করে সাইকেলের ঘণ্টি বাজিয়ে চাকায় কির্-র্-র্ শব্দ তুলে বিরু ফিরল।

খগাদা একবার দাঁড়াবার চেষ্টা করেই মুখ বিকৃত করে 'উঃ, মাগো' বলে পায়ের ব্যথায় বসে পড়লেন।

বসেই বিরুর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, খবর পেলে?

বিরু অধোবদনে দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে বলল হুঁ।

কী? খগাদা চিৎকার করে উঠলেন। তারপর বললেন, বলে ফেলো সোজাসুজি। আছে, না নেই? তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ভগা রে! আমার ভগাবাবু!

বিরু বলল, ভগাদা আছে। কিন্তু রাজার কয়েদখানায়।

হোয়াট? বলে খগাদা আবার উঠে দাঁড়াতে গিয়েই 'গেছি গেছি' বলে বসে পড়লেন।

তারপর হাতের কনকোয়েসট অব হ্যাপিনেস টাকে মাটিতে ছুঁড়ে বললেন, হোয়াই? হাউ কাম?

বিরু বললেন, বিলের ধারে রাজার পোষা হাতি চরছিল, ভগাদা তাকে গুলি করেছে।

হাতিকে? গুলি? পাখি-মারা ছর্‌রা দিয়ে? ইমপসিবল্! নিশ্চয়ই অ্যাকসিডেন্ট। তা বলে কয়েদখানায়? খগা সরকারের ভাই কয়েদখানায়?

বিরু, বিরুর কাকা ও আমি যখন খগাদার জিপ নিয়ে পদ্মার রাজার কয়েদখানা থেকে পঁচিশ টাকা জরিমানা দিয়ে ভগাদা, গিদাইয়া আর মোটরসাইকেলটাকে ছাড়িয়ে আনলাম, তখন রাত হয়ে গেছে।

আসবার পথে বিরু বলল, ভগাদা, কী করে এমন হল? হাতি কি তোমাকে তেড়ে এসেছিল?

ভগাদা বললেন, আরে না-না। এই গিদাইয়া ইডিয়েট্টার জন্যেই তো।

গিদাইয়া মাথা ঘুরিয়ে টিকি নেড়ে মহা প্রতিবাদ জানাল।

ভগাদা বললেন, বুঝলি বিলে এক ঝাঁক পিন্‌টেইল হাঁস ছিল। একটা পুটুস ঝোপের পাশে শুয়ে এইম করছিলাম। ভাবছিলাম, লাইন পেলেই একেবারে গদাম করে ঝেড়ে দেব, গোটা কয়েক উলটে যাবে। এমন সময়...

আমি বললাম, এমন সময় কী?

ভগাদা বললেন, এমন সময় গিদাইয়া কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, ভগা। ওয়াইল্ড এলিফ্যান্ট। তাকিয়ে দেখি, আমাদের পাশেই একটা হাতি দাঁড়িয়ে ফোঁস ফোঁস করে শুঁড় ঘুরিয়ে নিশ্বাস নিচ্ছে আর কান নাড়াচ্ছে। আমার মন বলল, নিশ্চয় পোষা হাতি ; রাজার। কিন্তু গিদাইয়া বলল, এক-একটা দাঁত পাঁচ-পাঁচ হাজার টাকা। অত হাজার টাকার কথা শুনেই আমার মাথা ঘুরে গেল। দিলাম দেগে এক নম্বর ছর্‌রা।

আমি রুদ্ধশ্বাসে শুধোলাম, তারপরে কী হল?

তারপর আর কী! হাতি বলল, প্যাঁ-অ্যা-অ্যা-অ্যা-অ্যা। আর আমি ও গিদাইয়াও একসঙ্গে ভ্যাঁ-অ্যা-অ্যা-অ্যা।

বিরু অবাক হয়ে বলল, কেঁদে ফেললে? এ মা, এত বড়ো লোক হয়ে কেঁদে ফেললে?

ভগাদা বললেন, হুঁ হুঁ বাবা, কান্না পেলেও না যদি কাঁদো, তবে সঙ্গে সঙ্গে ইস্‌কিমিয়া, মায়াকার্ডিয়াক অ্যাটাক। হার্ট এক্কেরে কিমা। জানিস না তোরা কিছুই।

বিরু বলল, তারপর?

তারপর আর কী? হাতি এসে ঘাড়ে পড়ার আগেই মাহুত আর রাজার পেয়াদা এসে ঘাড়ে পড়ল। বন্দুক কেড়ে নিল। আর কী রদ্দা, কী রদ্দা!

হাতিটাকে কোথায় মেরেছিলেন? আমি শুধোলাম।

ভগাদা বললেন, এইম করেছিলাম কানের পাশেই নিয়ম মাফিক।

গিদাইয়া এতক্ষণ পর কথা বলল। বলল, কিন্তু কুল্লে চার দানা ছর্‌রা গিয়ে লেগেছিল হাতির সামনের পায়ে গোড়ালিতে।

ভগাদা চটে উঠে বলল, য়্যু শাট আপ। দোস্ত তো নয়, সাক্ষাৎ দুশমন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরই খগাদা আমাদের নেমন্তন্ন করে খুব একচোট

খাওয়ালেন। ভগাদা চাকরিতে জয়েন করেছেন। অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা। নিজেই চেষ্টা চরিত্র করে জোগাড় করেছেন। এতদিনে ভাইয়ের একটা গতি হল। সকলেই খুশি, আমরাও। ভগাদা রোজ সময়মতো প্যান্ট আর হাওয়াইন শার্ট পরে অফিস যান।

দিন পনেরো বাদে খগাদা আবার আমাদের জরুরি তলব দিলেন। গেলাম। বুঝলাম, আবার কেস গড়বড়।

খগাদা বললেন, আবার একটা উপকার করতে হবে।

আমরা বললাম, বলুন কী করতে পারি! ভগাদা কি আবার কোনো ঝামেলা....

খগাদা বললেন, শোনো আগে। চাকরি করছিল ভগা, খুশি ছিলাম কত। কিন্তু গত কয়েকদিন অফিস যাচ্ছিল না। প্রথমে বলছিল পেটে ব্যথা। নাক্স-ভমিকা থারটি দিলাম। তারপর বলল, রাতে ঘুম হয় না। কালিফস্ দিলাম। তাতে ভোঁসভোঁস করে ঘুমোবার কথা। কিন্তু সমানে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে ভায়া আমার শুয়ে থাকে। কথাও বলে না, খায়ও না। তারপর ওআরস্ট অব অল, কাল থেকে পলাতক। কোথায় যে চলে গেল না বলে-কয়ে!

বিরু হঠাৎ বলল, চাকরির ব্যাপার একটু খোঁজ করলে হত না?

খগাদার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, ব্রিলিয়ান্ট! সাধে কি বলি, তোমাদের মতো ছেলে হয় না।

বিরু আমাকে বলল, চল, এক্ষুনি ব্যাপারটা জেনে আসা যাক।

খগাদার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে বিরু বেরিয়ে পড়ল সাইকেলে আমাকে ডাবল ক্যারি করে।

সবজিমণ্ডির পাশে মসজিদ, মসজিদের থেকে খানিকটা দূরে ক্কালু মিঞার কাবাবের দোকান, তার পাশে একটা ছোটো দোকানঘর—সবুজের উপর সাদায় লেখা সাইনবোর্ড ঝুলছে, ইন্টারন্যাশনাল সাপ্লায়ার্স। কিন্তু সেই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কেরোসিন তেলের টিন দিয়ে তৈরি দরজাটাতে একটা মস্ত বড়ো তালা ঝুলছে। আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম সাইকেল থেকে নেমে।

ইন্টারন্যাশনাল সাপ্লায়ার্সের উলটোদিকে একটা দর্জির দোকান। খয়েরি আর সাদা খোপ খোপ লুঙ্গি আর বেগ্‌নে কামিজ পরে মাথায় সাদা টুপি চড়ানো কালো চাপ দাড়িওয়ালা দর্জি আপনমনে ঝটপট করে পা মেশিনে রজাইয়ের ওয়াড় সেলাই করে যাচ্ছিল।

আমরা গিয়ে একটু কেশে দাঁড়ালাম।

দর্জি মুখ তুলে নিকেলের ফ্রেমের চশমার কাচের ফাঁক দিয়ে চোখ নাচিয়ে বলল, ফরমাইয়ে। বিরু বলল, খাস কাম কুছ নেহি। এই যে উলটোদিকের অফিসটা, সেটা বন্ধ কেন? তালা ঝুলছে কেন?

দর্জি বলল, দফ্তর বন্ধ হ্যায়। উঠ গ্যায়া।

উঠে গেছে মানে? আমরা শুধোলাম।

দর্জি বলল, জি হাঁ। তারপর ডান হাতের তিনখানা আঙুল বিরুর সামনে নেড়ে নেড়ে বলল, আপিস তো ছিল দুজনের, হেডবাবু গির্ধারী পাণ্ডে আর অ্যাসিস্ট্যান্ট ভগা সরকার। সেদিন কী নিয়ে কথা কাটাকাটি হতে অ্যাসিস্ট্যান্ট গিয়ে হেডবাবুর মাথায় হঠাৎ কাঠের রুলার দিয়ে মারল এক বাড়ি। সাথে সাথ মাথা ফট। হেডবাবু হাসপাতালে আর অ্যাসিস্ট্যান্ট ফেরার। আপিস আর চালাবে কে? কিওরারি বন্ধ।

আমরা ফিরলাম। খগাদা উদ্গ্রীব হয়ে বসেছিলেন। বললেন, কী খবর?

বিরু গম্ভীর মুখে বলল, আপিস উঠে গেছে, হেডবাবু হসপিটালে, অ্যাসিস্ট্যান্ট এবস্কন্ডিং।

খগাদা প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে মার্ডারার, মার্ডারার, কোথায় গেলি, কোথায় গেলি বলেই দৌড়ে বারান্দার দিকে গেলেন, যেন ভগাদা বারান্দাতেই বসে আছেন।

খগাদা বারান্দাতে গিয়ে পৌঁছোতেই ভগাদার ঠোঁটকাটা কাকাতুয়াটা খ্যান্‌খেনে গলায় বলে উঠল, হাইপারটেনশন। হাইপারটেনশান্।

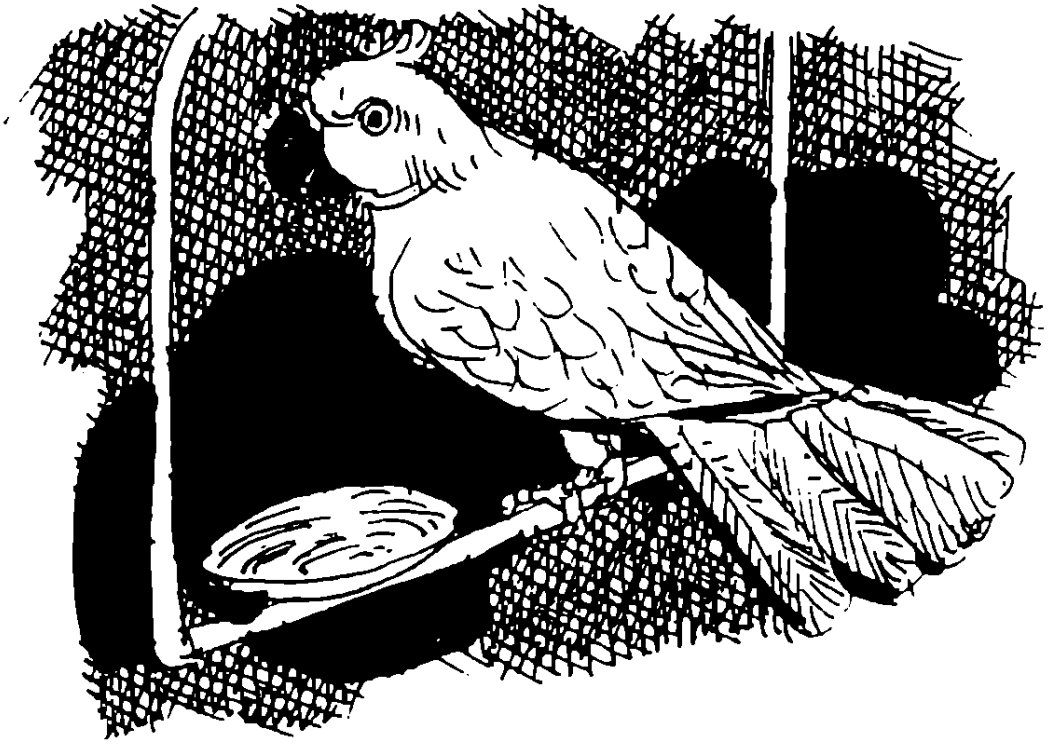

দাঁতের বদলে দাঁত

সুন্দরবনের বালিতে নেমে পদচারণা করা হচ্ছে, যতটা ক্ষিদে বাড়বার জন্যে, ততটা বেড়াবার জন্যে নয়। বেলা পড়ে আসছে। আমাদের মোটর বোট বাঁধা আছে, পাশের খালে। বঙ্গোপসাগর থেকে জোয়ারের জল একটানা কুল্‌কুল্‌ শব্দ করে বালির ওপর আমাদের পায়ের দাগ মুছে দিচ্ছে। ভাঙ্গাডুনি দ্বীপের দিকের বালুকাবেলায় একজোড়া চিতল হরিণ চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে আছে, হলতে-সবুজ হ্যাঁতাল গাছের পটভূমিতে। শেষ বিকেলের গলানো সোনা জলে-ডাঙ্গায় চিক্‌ চিক্‌ করছে। একঝাঁক কার্লু পাখি কিচ্‌মিচিয়ে আমাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলে যাচ্ছে।

সকলেই নানান্‌ গল্প করছিলেন, বেশিরভাগই নিজের নিজের

অভিজ্ঞতার। মিস্টার দাশ আমাদের সঙ্গে ছিলেন। উনি যে শুধু ভাল শিকারি তাই নয়, অত্যন্ত রসিক লোক এবং চমৎকার সঙ্গী।

দাশসাহেব বললেন, একটা গল্প শুনুন।

উড়িষ্যার অঙ্গুল সাব্ ডিভিশানে টুম্বকার জঙ্গলের ঘটনা। বহুদিন আগের স্থানীয় একজন সাব-ডিভিশনাল অফিসারের শিকারের খুবই শখ ছিল। ভদ্রলোক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এবং পরম উৎসাহী। একদিন বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেলেন যে, জঙ্গলের মধ্যে, বিশেষ জায়গায় একটি বিশেষ বাঘ প্রায়ই আসছে জল খেতে।

গরমের দিন। পাহাড়ে পাহাড়ে তৃষ্ণার ঝড়। সারা দুপুর ধনেশ পাখিরা কুচিলা গাছের ঘন পাতার আস্তরণের আড়ালে বসে বড় বড় ঠোঁট হাঁ করে নিঃশ্বাস নেয়। শম্বরের দল পাহাড়ের নীচে গভীর ও ছায়াশীতল উপত্যকায় চুপ করে শুয়ে থাকে। শুয়োরের দল গভীর নালায় মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। মুখের কাছে কাঁচপোকাগুলো গুন্‌গুন্ করে। সারা প্রকৃতি তখন গর্ভিণী রমণীর মতো আলস্যে ঘুমায়। কিন্তু যেই বিকেল হয়, সূর্য পশ্চিমে হেলে ; ছায়াগুলো বনের পথে পথে দীর্ঘতর হয়ে আসে ; অমনি সারা বন জেগে ওঠে। বাঘমশাই ঘুম থেকে উঠে আড়মোড়া ভাঙেন, যেন নবাবপুত্র ; তারপর দুল্‌কি চালে চলেন জলের দিকে।

এস-ডি-ও সাহেব বাঘের রাহান্‌সাহানের খোঁজ রাখতেন। অতএব, বেশ বেলা থাকতে এক শনিবারের দুপুরে তাঁর থার্টি-ও-সিক্স ম্যান্‌লিকার রাইফেলটি কাঁধে ঝুলিয়ে একজন অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে জায়গামত গিয়ে পৌঁছলেন। গরমের সময় জলের কাছে বাঘ মারা উচিত কী না সে প্রশ্নে যাচ্ছি না। নিশ্চয়ই উচিত নয়। কিন্তু সব লোকই উচিত কর্ম করলে তো এদেশ একটা দেশের মত দেশ হয়ে উঠত এতদিনে।

যাঁরা আকছার শিকার করেন, তাঁরা একটু অসাবধানীও হয়ে পড়েন। এস-ডি-ও সাহেব ভাবলেন মাচা বেঁধে আর কি হবে? জলের পাশে একটা বুড়ো থুত্থুরে অশ্বত্থ গাছ আছে, তার ফোকরে উঠে বসলেই চলবে। অতঃপর ফোকরে গোটা দুই পাথর ফেলে দেখে নিলেন যে তাতে গোখরো কি শঙ্খচূড়ের বাসা আছে কি নেই। যখন ফোঁস-ফাঁস কিছুই শুনলেন না, তখন নির্ভয়ে উঠে বসলেন ফোকরে।

কিন্তু সাহেবের রাইফেলটা খুব জবরদস্ত ছিল না। ওই রাইফেল দিয়ে বাঘ যে মারা যায় না তা নয় জায়গামত গুলি লাগলে কাটা কলাগাছের

মতো ধপাস্ করে বাঘ ওখানেই পড়ে যাবে। কিন্তু বাঘ শিকার সংখ্যাতত্ত্ববিদ্ কিংবা আবহাওয়াবিদ্ অথবা ঐতিহাসিকের নজির মেনে সবসময় চলে না। শতকরা এক ভাগও যদি অনিশ্চয়তা থেকে থাকে, সেই এক ভাগই একটি সামান্য মনুষ্যের ইহলীলা সাঙ্গ করার পক্ষে যথেষ্ট।

আসলে, এই রাইফেল দিয়েই মাস ছয় আগে, শীতকালে মাচা থেকে, আমাদের এস-ডি-ও সাহেব দু-ফুটি বড় বাঘ মেরেছিলেন। এবং তাতেই তাঁর রাইফেলের উপর ভক্তি অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল। তবু, গাছের ফোকরে বসে, এদিক ওদিকে চাইতে চাইতে সাহেবের একবার মনে হল ; বার বার যদি ঘুঘু ধান না খায়?

ভাববার সময় ছিল না বেশি। দেশি বাঘ; অথচ আশ্চর্যরকম প্যাংচুয়ালিটির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে খাঁটি সাহেবের মতো অ্যাপয়েন্টমেণ্ট্ রাখলো। পাঁচটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট। হয়তো জানত যে, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সাহেব তার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

সাহেব আমাদের তৈরিই ছিলেন। বাঘ এসে জলের ধারে দাঁড়াতেই গুড়ুম করে দেগে দিলেন। এবং পরক্ষণেই বাঘ আকাশের দিকে মুখ তুলে চিৎপটাং হয়ে পপাতধরণীতলে।

সাক্ষাৎ ক্যাসিয়াস্ ক্লে ডান হাতে আপার-কাট্ মারলেও বেচারার অত লাগত না।

আমাদের এস-ডি-ও সাহেব, আত্মতুষ্টিতে বুঁদ হয়ে, পকেট থেকে পাইপ্ বের করে তামাক পুরে কষে এক টান লাগালেন।

পাইপের এক টানের সঙ্গে সঙ্গেই বাঘ যন্ত্রচালিত কলের মত তিড়িং করে লাফিয়ে মুহূর্তের মধ্যে চোখের আড়ালে অন্তর্ধান করল।

সাহেব বিড় বিড় করে অশ্রাব্য ফ্রিস্কুল-স্ট্রিটের ইংরিজিতে বাঘকে গালাগালি করলেন। বাঘ যদি ইংরিজি জানত, তবে গালাগালি শুনে সে নিশ্চয় নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকত না ; সাহেবকে কষে এক থাপ্পড় লাগাবার জন্যে তেড়ে আসত এবং সঙ্গে সঙ্গে আর একখানা গুলি খেয়ে পট্কাত। কিন্তু বাঘ ইংরিজি জানে না এবং তার গলার পাশে যে গুলি লেগেছিল তার যন্ত্রণায় সে তখন প্রায় বেহুঁশ ছিল।

এই দুর্ঘটনার দিন সাতেক পর এস-ডি-ও সাহেব আবার বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেলেন যে, একটা বাঘ ওখানেই জল খেতে আসছে। তার গলায় নাকি গলগণ্ড হয়েছে।

গলগণ্ড হয়েছে কি না তা অবশ্য কোনো কবিরাজ দেখে বলেননি। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে প্রকাশ যে, বাঘের গলাটা ফুলে প্রায় জলহস্তীর পেটের মতো হয়ে গেছে।

অতএব আর কালবিলম্ব না করে, সাহেব ঠিক করলেন যে, যে জঙ্গলে বাঘ আছে, সেখানেই ছুলোয়া করাবেন। কারণ, নির্ঘাৎ বাঘের গলা গুলি ছুঁয়ে গেছে, এবং বাঘ এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে এ জায়গা ছেড়ে চলে যায়নি। গলগণ্ডর মূল গণ্ডগোল তিনিই স্বয়ং।

পরদিন সকালে শিকারের সব বন্দোবস্ত হল। অনেকগুলো মাচা বাঁধা হল। সাহেব এবং তার অন্যান্য বন্ধুবান্ধবেরা পর পর মাচায় বসলেন। হাঁকোয়া শুরু হয়ে গেল। ঢাক, শিঙে, ক্যানেস্তারা ইত্যাদি নানারকম বাদ্যযন্ত্রের সম্মিলিত আওয়াজ ও হাঁকোয়া-করনেওয়ালাদের সমবেত চিৎকার ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল।

হাঁকোয়াওয়ালারা তখনো বেশ দূরেই ছিল। এমন সময় গলায় গলগণ্ড নিয়ে বাঘ রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করল।

বাঘ যেখান দিয়ে বেরুল, সেখানেই এস-ডি-ও সাহেব এবং তাঁর এক বন্ধু বসেছিলেন। বাঘ বেরিয়ে একেবারে সোজা সাহেবের বন্ধুর মাচার দিকে এগিয়ে গেল। বাঘ আগেই মাচাটা দেখেছিল কি না তা অবশ্য কেউ বলতে পারেননি কিন্তু সে ভদ্রলোক বন্দুক বাগিয়ে পাঁয়তারা করবার আগেই, বাঘ এক লাফে মাচায় উঠে আমরা যেমন করে তপ্‌সে ফ্রাই কামড়াই তেমনি করে তাঁর ঘাড় কামড়ে ধরে। তাঁর পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি ঘটিয়ে দিল।

বন্ধুর এই অবস্থা দেখে সাহেব কাণ্ড-জ্ঞানরহিত হয়ে মাচা থেকে নেমে দৌড়ে বাঘের দিকে যেতে যেতে একটি গুলি করলেন। সাহসেরও অভাব ছিল না সাহেবের। গুলিটা লাগল গিয়ে বাঘের চোয়ালে। এবং তাতে বাঘের সবকটি দাঁত একেবারে চুর্ চুর্ হয়ে গেল। চোয়ালে গুলি খেয়ে বাঘ গলগণ্ডর কথা প্রায় ভুলে গিয়ে যন্ত্রণায় পাগল হয়ে সাহেবকে আক্রমণ করল। কিন্তু বাঘ সাহেবের ঘাড়ে পড়ার আগেই সাহেব আরও একটি গুলি করে দিলেন। সে গুলিটা দিয়ে লাগল্ বাঘের বুকে। ফুসফুসের একটু নীচে। তাতেই বাঘ বেশ কাবু হয়ে গেল তবু আক্রমণে যে গতিবেগের সঞ্চার হয়েছিল, সেই গতিবেগে বাঘ সাহেবের প্রায় গায়ের কাছে পৌঁছে এক বিরাশী ওজনের চড় লাগাল সাহেবের গালে।

কিন্তু রাখে কেষ্ট মারে কি? এমনই বরাত যে, অত জোরে যে চড়টা

মারল বাঘ, এত কাছ থেকে মারার জন্য হোক কি যে কারণেই হোক ; সে চড়ে একটিও নখ লাগল না সাহেবের মুখে মাথায়। কেবল থাবার মধ্যবর্তী নরম চেটোটি গিয়েই লাগল সাহেবের গালে। গ্লাভস পরা ঘুসিও ঘুষি! রয়্যাল-টাইগারের চেটোর চড়ই যথেষ্ট। বেচারা সাহেবের একটি দাঁতও আস্ত রইল না। এবং সাহেব অজ্ঞান হয়ে একটি উই-ঢিপির পাশে ঝোপের মধ্যে পড়ে গেলেন।

ততক্ষণে সন্ধে হয়ে গেছে। সাহেবের বন্ধুরা গুলির শব্দ শুনেছিলেন। তাঁরা সবাই আলো নিয়ে সাহেবকে খুঁজতে এলেন। সাহেবের বন্ধুকে পেলেন মাচাতেই। তাঁর ধড় থেকে মাথা প্রায় আলাদা হয়ে গেছিল। কিন্তু গভীর রাত অবধি ওঁরা বহু খোঁজাখুঁজি করেও সাহেবকে পেলেন না। কারণ, সাহেব উইঢিপির আড়ালে এমনভাবে পড়েছিলেন যে, রাতে তাঁকে বন্ধুরা দেখতেই পেলেন না।

এদিকে বন্ধুরা যখন ওঁকে খুঁজছিলেন তখন সাহেবের কিন্তু জ্ঞান এসে গেছে। কিন্তু সমস্ত মুখ রক্তে ভরা এবং রক্ত জমে মুখের ভেতরটা একেবারে কাদার মত হয়ে গেছে এবং সে কারণে চেঁচাতেও পারেননি। উত্থানশক্তিও ছিল না যে উঠে বসবেন।

সাহেবের বন্ধুরা ঝোপের ভিতর পড়ে থাকা বাঘ এবং সাহেব কাউকেই অন্ধকারে খুঁজে পেলেন না। ভাবলেন যে, বাঘ সাহেবকে মুখে নিয়ে কোথাও চলে গেছে এবং উনি নিশ্চয়ই বেঁচে নেই। সকালের আগে আর খোঁজাখুঁজি করে কোনো লাভও নেই। এ সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁরা ফিরে গেলেন।

সাহেব সারা রাত বোবার মতো সেই উইয়ের ঢিপিতে পড়ে রইলেন। যন্ত্রণা তেমন ছিল না—কারণ সদ্য মৃত্যু-ভয়-মুক্ততার যে আনন্দ, তার কাছে শারীরিক কোনো যন্ত্রণা যন্ত্রণাই নয়। তবে মাঝরাতে একটি বুড়ি ভাল্লুক এসে তাঁকে একটু শুঁকে-টুঁকে উল্টে পাল্টে নিনি-বব্বা-নিনি-মাখন চিনি করে আদর করে দিয়ে চলে গেছিল।

পরদিন ভোরে দন্তহীন, বাক্‌রহিত সাহেবকে এবং বাঘের লাশ উদ্ধার করলেন বন্ধুরা।

দাশ সাহেব বললেন যে, পরবর্তী জীবনে মাউন্ট করা ঐ বাঘটির দন্তহীন মুখের দিকে চেয়ে সাহেবের দন্তহীন মুখ হাসিতে ভরে উঠত কি না তা আমার জানা নেই ; তবে দাঁতের বদলে দাঁতের এমন অবিশ্বাস্য ঘটনা আর আছে বলে মনে হয় না। ❑

ধুধুগাওয়ার পুনুয়া

সবে বৃষ্টি হয়ে গেছে এক পশলা।

শ্রাবণ-শেষের পিলাবিবির বনে, বনপ্রান্তের ঘন সবুজ মাঠে, বৃষ্টির গন্ধ তখনও মাখামাখি হয়ে আছে। বনের গভীরে জংলী গোঁড় লেবুর ঝাড়ে ঝাড়ে লেবু ফুল ফুটেছে। তারই গন্ধ নিয়ে খরগোশের মতো ছোটাছুটি করছে বৃষ্টি-শেষের হাওয়া। বৃষ্টির জলের তোড় ঘাসের মধ্যে মধ্যে যেখান দিয়েই নিজের পথ কেটে বয়ে গেছে, সেইসবখানেই মরা ঘাস, কুটো, ঝরা-ফুল পথ চিহ্ন হয়ে, রয়ে গেছে।

ফড়িং উড়ছে মাঠের উপরে ফনফনিয়ে। আর ফড়িং ধরার জন্যে পাশের পুনুয়া গাঙ থেকে গাঙ-শালিকেরা এসে ওড়াওড়ি করা ফড়িংদের কপাকপ

করে গিলে খাচ্ছে। শ্রাবণের প্রবল বর্ষণে দানুয়ার নয়া-গাঙের মরা-সোঁতাতে প্রাণ এসেছে। নানান পাখি ডাকছে বনের ভিতর থেকে ডানার জল ঝেড়ে ফেলে শুকনো হয়ে উঠে। চাকচিক্য লেগেছে তাদের গলার চিকণ স্বরে।

কিছু পাখির ডাক পুনুয়া চেনে। কিছু অচেনা।

চারিদিকের গাঢ়-সবুজ, ফিকে-সবুজ আর কচি-কলাপাতা-রঙা প্রকৃতির অণু-পরমাণু এক আশ্চর্য সুন্দর জলজ বনজ গন্ধে ভরে গেছে। নির্জন পৃথিবী বৃষ্টিতে চান করে উঠে নবীকৃত হয়েছে। বুনো নিমগাছেদের ডাল থেকে, বৃষ্টির আগেই যে হাওয়া উঠেছিল মেঘলা আকাশের চাঁদোয়ার নিচে নিচে, চাঁদোয়াতে ঢেউ তুলে ; সেই ঝুরুঝুরু হাওয়াতে নিমফুল উড়ে উড়ে ভেসে গেছে দূর থেকে সুদূরে, যেমন করে দোলের সময় শিমুলের বীজ ফেটে শিমুল-তুলো উড়ে যায় আলতো পায়ে, বাতাসের গায়ে ভর করে। দুটি পাহাড়ী দাঁড়কাক একটি কেঁদ গাছে বসে ঘাড় বেঁকিয়ে কুটিল চোখে সেই নিমফুলেদের ভেসে যাওয়া দেখেছে। নীরবে।

একটা মস্ত বড় শিমুল গাছ গতবছর এই সময়ে বাজ পড়ে জ্বলে গেছিল। তার একটি ডাল ভেঙে পড়েছিল নিচে। সেই মস্ত কিন্তু ভূতলশায়ী ডালটির উপরে বসে ছিল পুনুয়া, উদাস চোখে উদ্দেশ্যহীনভাবে মাঠের দিকে, বনের দিকে চেয়ে। পুনুয়ার বয়স দশ। তার বাস এই বনের কাছেই ধুধুগাওয়া গ্রামে। ওর বাড়িতে মা ও এক বোন আছে। জমি-জমা বলতে কিছুই নেই। জঙ্গলের মূল খুঁড়ে, ফল কুড়িয়ে, শুয়োর আর হরিণ আর ভাল্লুকদের সঙ্গে লড়াই করে যা আনতে পারে, তাই খায়। পুনুয়ার মা জাদুকরী রাঁধুনি। শুধু জঙ্গলের ঘাস সেদ্ধ করেই তাতে নুন-ঝাল স্বাদ তুলে এমন করে খেতে দেয় যে, পুনুয়ার মনে হয় যে অমৃত খাচ্ছে।

শীতকালে যখন ধুধুগাওয়া গ্রামের ক্ষেতে ক্ষেতে ফসল লাগে নানারকম, বাজরা, কুলথী, অড়হড়, কিতারি, তখন নানা জানোয়ারে এসে সেইসব ফসল নষ্ট করে দেয়। শীতের মুখে যখন ধান পাকে, তখন হরিণ, শম্বরে এসে ধান নষ্ট করে। বহু কষ্টে-করা চিনাবাদাম খেয়ে যায় ধাড়ি ধাড়ি পাটকিলে খরগোশে। ভাগ্যিস ওদের এদিকে হাতি নেই। হাতি থাকলে তো ধান চাষ করাই যেতো না। সারা বছরের পরিশ্রম একদিনেই সাবড়ে দিয়ে যেত।

শীতকালে পুনুয়া কিছু পয়সা রোজগার করে নেয়। তখন অবস্থাপন্ন মানুষেরা, যাদের জোত-জমি আছে, তারা ওকে ক্ষেত পাহারা দেওয়ার জন্যে বহাল করে। আর দিনের বেলা ক্ষেত থেকে পাখি তাড়ায়। মানুষ-কাকতাড়ুয়া

হয়ে যায় পুনুয়া। অবশ্য ছেঁড়া জামা-কাপড়, বাঁশের কঞ্চি, শুকনো কাঠ, খড় ইত্যাদি দিয়েও সকলে কাকতাড়ুয়া বানিয়ে রাখে যার যার ক্ষেতে। কিন্তু ধুধুগাওয়ার চারপাশের জঙ্গলে যে সব পাখ-পাখালি আছে তারা বড় সেয়ানা। তারা কাকতাড়ুয়াদের চিনে নেয়—ভ্রূক্ষেপ না করেই ক্ষেতে নামে। তখন পুনুয়া ফাটা-বাঁশের মধ্যে দড়ি দিয়ে বাঁধা অন্য বাঁশের টুকরোকে খিলের মতো ব্যবহার করে ফটাস-ফাটাস করে শব্দ করে পাখিদের ভয় দেখায়। পাখিরা কিচির-মিচির করে হাওয়া-লাগা রঙিন শাড়ির মতো উড়ে যায় ঘন বনের দিকে, নীলাকাশের চাঁদোয়ার নিচে নিচে।

সবচেয়ে হয়রান করে টিয়াপাখিরা। টিয়াকে ওরা বলে সুগা। অনেক পাখি থাকে একেকটি দলে। মকাই-এর ক্ষেতে নেমে ঠোঁটে করে মকাই ছিঁড়ে নিয়ে যায়—। আদ্ধেক খায়, আদ্ধেক ফেলে নষ্ট করে। পেয়ারা যখন ফলে, তখনও ওরকমই করে। যত না খায়, ঠুকরে নিচে ফেলে নষ্ট করে তার চেয়ে ঢের বেশি। তবে খুবই পেয়ারা হয় এই অঞ্চলে। সারাবছরই পেয়ারা হয়। তখন গরীব মানুষ তো খায়ই, টিয়া, শেয়াল, গরু-বাছুরও পেয়ারা খেয়ে নেয় মনের সুখে। বসন্তের শেষে মহুয়া ফলতে শুরু করে। মহুয়ার গন্ধ ম' ম' করে তখন অলস মৃদুগতি হাওয়া, করৌঞ্জ আর অন্যান্য বাসন্তী ফুলের গন্ধের সঙ্গে।

বসন্তে পুনুয়ার মন ভারী খারাপ হয়ে যায়। এই মন খারাপ কিসের জন্যে, কোন অভাবের জন্যে তা ও বোঝে না। অভাব তো ওদের অনেকরকম —সারাবছর—অভাব তো থাকেই, আছেই জন্মাবধি, কিন্তু বসন্তের হাওয়াতে যে মন-কেমন করা, তার সঙ্গে সেই খাওয়া বা পরার অভাবের যেন কোনোই সম্পর্ক নেই। জানে না, কেন অমন হয়। কোকিলগুলো তখন বনে বনে পাগলের মতো ডাকাডাকি করে। ওদেরও কি মন খারাপ করে? কে জানে! আর পিউ-কাঁহারা! তারাও সারারাত জ্যোৎস্নাতে সাঁতার দিতে দিতে ডেকে বেড়ায়, পিউ-কাঁহা? পিউ-কাঁহা? কাঁহা-কাঁহা-কাঁহা-কাঁহা করে।

পুনুয়ার মা পুনুয়াকে প্রায়ই বকেন। বলেন, দিনকে দিন বয়স বাড়ছে, টাকা রোজগারের কোনো ধান্দা নেই, চিন্তা নেই, বাপ মরে গেছে সেই কবে! আমি আওরাৎ হয়ে কি সারাজীবন তোমাকে খাওয়াব? তুমি কি চিরদিনই খোকাবাবু হয়েই থাকবে? বনে-পাহাড়ে উদ্‌ভ্রান্তর মতো ঘুরে বেড়াবে সারাটা দিন?

এই 'উদ্‌ভ্রান্ত' শব্দটা বেশ ভাল লাগে পুনুয়ার। শব্দটির মানে যে ঠিক

কি তা ও জানে না। কিন্তু নিজেকে বেশ রাশভারী লাগে এই গালাগালিতে। অন্যায় করলেও, বেশ সম্ভ্রান্ত কিছু অন্যায় যে করেছে, এমন মনে হয় পুনুয়ার।

পুনুয়ার কোনো বন্ধু নেই। ওকে ওর সমবয়সীরা কেউই বোঝে না। অসমবয়সীরাও বোঝে না। ও বোঝাবার চেষ্টাও করে না কারোকে। ও আপনিতে আপনি সম্পূর্ণ। এই বন, পাহাড়, পাখি, এই হাওয়া, এই আকাশ, বাতাস, বনের নানা জন্তু-জানোয়ার, দানুয়ার গাঙের সোঁতা, বর্ষাতে প্রাণ-পাওয়া কত সব নালা ও প্রপাত, এই নিয়েই ওর বেশ কেটে যায় দিন। গভীর শান্তিতে।

মানুষ বড় কথা বলে, সবসময়েই বড় খাই-খাই করে, কখনওই সুখী নয় মানুষেরা। যারা ধুধুগাওয়ার গ্রামের বড়লোক, মহাজন, মাহাতো, শেঠ—তারাও নয়। আসলে পুনুয়া তার বুকের গভীরে এই বনজ শান্তিকে যেমন করে জেনেছে, তেমন সুন্দর স্নিগ্ধ শান্তির কথা সম্ভবত ওরা ভাবতেই পারে না।

পুনুয়াকে মা প্রায়ই বকেন। বলেন, তোর কি কোনো ঋণ নেই? তোর চলে-যাওয়া বাবার কাছে? আমার কাছে? এই ঋণশোধের কথা কি তোর একবারও মনে হয় না? তোর বয়স হলো তেরো। তোর ছোট বোন আছে। তাকে বিয়ে দিতে হবে। তুই কেমন দাদা?

পুনুয়া চুপ করে থাকে। মায়ের কথার উত্তর না দিয়ে বনে পালায়। আজ যেমন ভরা-শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন দুপুরে বৃষ্টির পরে আহ্লাদী ফড়িংদের এলোমেলো ওড়া দেখতে দেখতে ও বাবা-মায়ের ঋণের কথা ভাবে, অন্যদিনও ভাবে। ভাবে সবসময়ই।

বাবা-মায়ের কাছের ঋণ ছাড়াও অন্য অনেক ঋণও ওর অবশ্যই আছে। সে ঋণ বড় গভীর ঋণ। পারিবারিক ঋণের চেয়ে অনেক গভীরতর সেইসব ঋণ। যে ঋণ জমা হয়েছে, জমা হয়ে হয়ে প্রতি মুহূর্তে ভারী হচ্ছে সেই ঋণ, যে ঋণ প্রত্যেক মানুষেরই জন্মাবধি এই আকাশের কাছে, বাতাসের কাছে, এই বিচিত্ররঙা, বিচিত্রগন্ধী, বিচিত্র শব্দময় প্রকৃতির অণু-পরমাণুর কাছে। অরণ্যর কাছে যেমন, তেমন প্রত্যেকটি গাছেরও কাছে, পাখির কাছে, প্রজাপতির কাছে, ফুলের কাছে, ফলের কাছে ; যেমন কুঁচফলের কাছেও। এইসব ঋণও কি পুনুয়া শোধ করতে পারবে কোনোদিন?

পুনুয়া জানে যে, পারবে না। বাবা-মায়ের ঋণেরই মতো প্রত্যেক মানুষের জীবনে অনেকই ঋণ থাকে, অনেক অনেক : যার কণামাত্রও শোধ করা যায়

না। সেইসব ঋণ শোধ করার স্পর্ধাও সে কোনোদিন করবে না। তবে স্বীকার করে, স্বীকার করবে আজীবন, স্বীকার করে ধন্য করবে, পুণ্য করবে নিজেকে।

হঠাৎ এক ঝাঁক কচি-কলাপাতারঙা টিয়া, ডানা শনশনিয়ে ট্যা ট্যা করে ডাকতে ডাকতে ওর মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলে গেল, ওর এই দুপুরবেলার ঘোর ভাঙিয়ে দিয়ে। এবারে উঠতে হবে পুনুয়াকে। মাহাতোদের ঘরে যেতে হবে একটু শুকনো মকাই ধার চাইবার জন্যে। মাহাতোর ভাণ্ডার অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার। সবসময়েই তা পূর্ণ থাকে। কিন্তু মাহাতো জানে যে, তার সব জোরটুকু আসে ঐ ভাণ্ডার থেকেই। তার ভাণ্ডার যাতে খালি না হয়, তার মজুত-করা খাদ্যশস্য যাতে কমে না যায় সেদিকে সবসময়েই তার সজাগ দৃষ্টি। এই ভাণ্ডারই তার টাকা, তার লাঠি, তার ক্ষমতা, তার মান-মর্যাদা সব। হয়তো দেবে একমুঠো, কিন্তু দেওয়ার সময়ে মুখটা বিকৃত করে বলবে, "ধার" চাইবার বড়লোকী কেন রে ভিখারীর বাচ্চা? বল, "ভিক্ষে" চাইছিস, "ভিক্ষে"।

পুনুয়া ওর ছেঁড়া জামাটাই পেতে দাঁড়িয়ে থাকবে মাহাতোর গর্বিত চোখের সামনে। বিড়বিড় করে মনে মনে বলবে, এ ঋণ তোমার কাছে নয় মাহাতো, এ ভিক্ষাও তোমার দেওয়া নয়। যিনি আকাশ দিয়েছেন, বাতাস, যিনি জল দিয়েছেন, ফুল দিয়েছেন, প্রাণ দিয়েছেন, কৃতজ্ঞতাবোধ দিয়েছেন আমাদের, এসব আসলে তাঁরই দান। তোমার চোখের দৃষ্টি বড়ই কম দূর অবধি যায় মাহাতো। দূর অবধি গেলে, তুমি বুঝতে পেতে যে, তুমি কেউই নও। আমাকে দিয়ে তুমি আমাকে ধন্য করছ না, আমাকে যে তুমি দিতে পারছ এই কারণেই ধন্য করছ নিজেকেই।

পুনুয়া না বলে মাহাতোকে বলবে, মাহাতো, আকাশ যেন তোমাকে ক্ষমা করে, মাহাতো, ক্ষমা করে যেন বাতাস, যেন পাহাড় ক্ষমা করে, ফুল, পাখি, প্রজাপতি সকলেই যেন ক্ষমা করে তোমাকে। ❑

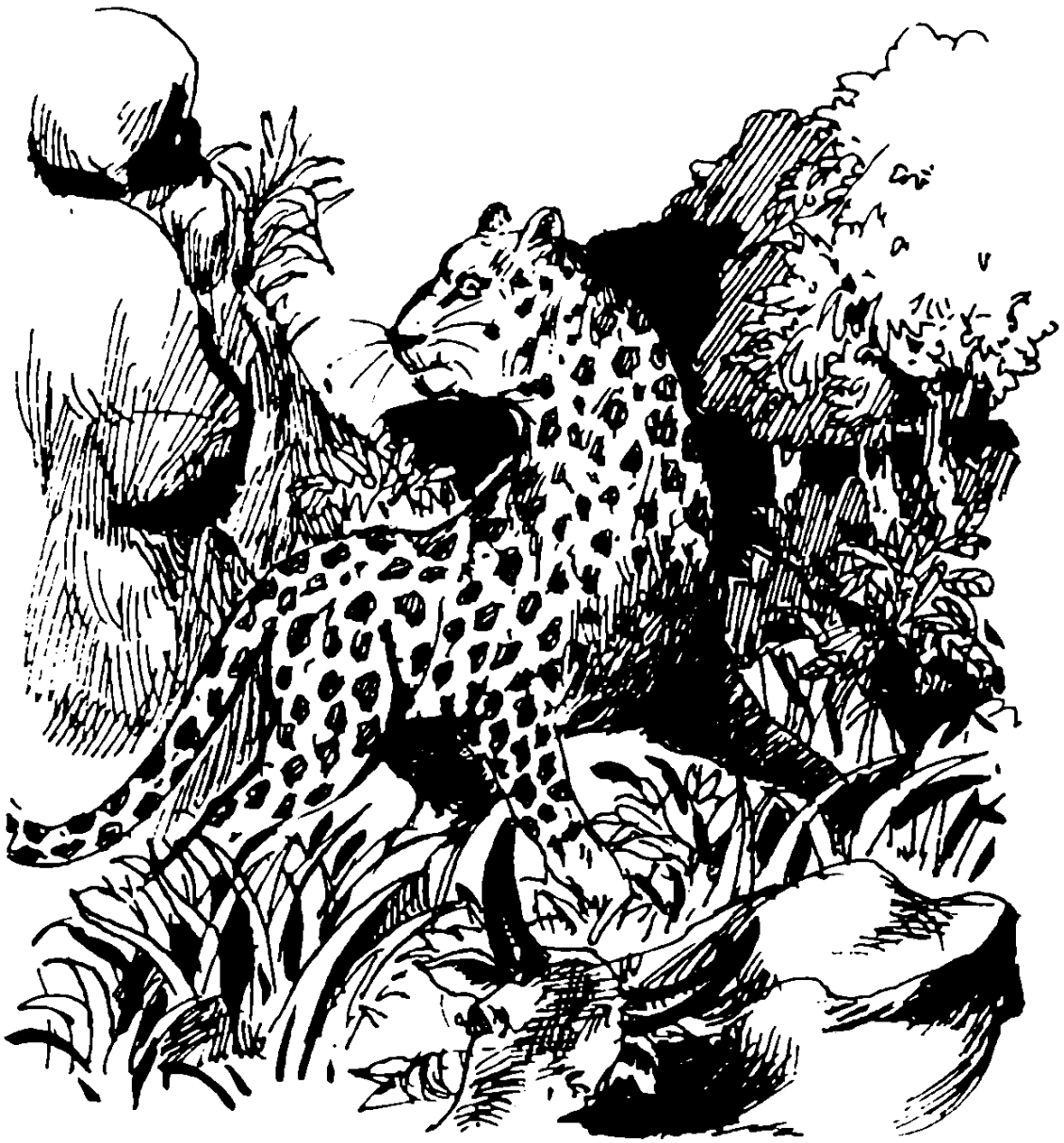

আলোকঝারির চিতাবাঘ

আসামের এদিকটাতে আগে আসিনি। বেশ লাগছে জায়গাটা। একপাশে আলোকঝারি পাহাড়শ্রেণী আর একপাশে লালমাটি পাহাড়ের লাজ-রক্তিম হাতছানি। আর আরও দূরে আছে পর্বতজুয়ার। বাংলো থেকে আট মাইল হাঁটতে হয়, পথে সাঁওতাল সর্দ্দারের বাড়ি পড়ে। আরও এগিয়ে আমঝোরা, সবুজ শালবনে ঘেরা পাহাড়ে পাহাড়ে সাঁওতালদের গাঁ, সবজিবাগান, ছবির মতো চোখে পড়ে আসা-যাওয়ার পথে।

অনিমেষ সঙ্গে এসেছিল। শিকার করবার চেয়ে শিকার দেখবার শখ

বেশি। দিনকয়েক সঙ্গে থেকে ও কলকাতায় চলে গেছে। আমায় থাকতে হয়েছে গ্রামবাসীদের অনুরোধে, আলোকঝারির চিতাটির ঝামেলা সইতে। দিনে দিনে অত্যাচারী হয়ে উঠছে চিতাটা। আজ এর ঘর থেকে ছাগল নিয়ে যায়, কাল গোয়ালে ঢুকে গরু মারে, পরশু হাটফিরতি গাঁ-এর লোকদের থাবা বসায়। এমনি উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিল লোকজনেরা। তাদেরই অনুরোধে আমায় প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছে যে, তাদের শত্রু দমনে যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

দিন দশেক আছি এখানে। লালমাটিতে তিনটে চিতল হরিণ পেয়েছি, আর বনশুয়োর গোটা পাঁচেক পর্বতজুয়ারে। সাঁওতালেরা ভারী আমোদে খাওয়া-দাওয়া করেছে, অনিমেষের সঙ্গেও কিছু মাংস রওয়ানা হয়েছে কলকাতার প্লেনে চড়ে।

চিতাটির খোঁজ-খবর করছি। ঢোল দিয়েছি, যদি কোনও জানোয়ার মারা পড়ে চিতার হাতে, সঙ্গে সঙ্গে যেন খবর আসে আমার কাছে, পাঁচ টাকা বকশিস মিলবে। তবে এখানকার লোক এমন দু'মাইল হাঁটাকে একটা বিষম দায় মনে করে, তাদের গরু-ছাগল মারা পড়লেও খুব কম লোকই এসে খবর দেবার কষ্টটুকু স্বীকার করতে চায়।

ধূর্ত চিতাটার নাগাল মেলা ভার। তাই খবরের আশায় থাকি, সকাল-বিকেল বন্দুক কাঁধে করে তিতির আর বনমুরগী মেরে বেড়াই, আর দুপুরে রবীন্দ্রনাথের কাব্য পড়ি।

সেদিন আলোকঝারির মেলা। পাহাড়ের বুকে মহামায়ার পীঠ। দলে-দলে পাহাড়ি লোক আসে পুজো দিতে—অসংখ্য বলি পড়ে। অনেক ছাগল আর অনেক কবুতর। নির্জন পাহাড়টার বুকের মাঝে আলোড়ন ওঠে একটা, দূর থেকে শোনা যায় চেঁচামেচি, হই-চই, সাঁওতালি বেদের কবুতর ফেরি করার চিৎকার। মেলা দেখতে গিয়েছিলাম। বসুমাতারীর দোকানে হঠাৎ ঝুমরুর সঙ্গে দেখা। ও বললে, সাহেব, এখুনি আপনার কাছে যাচ্ছিলাম। আজ শেষরাতে মোদের গাঁয়ে গাস্তিয়ার বাড়ি গরু মেরেছে একটা সেই দুশমন চিতাটা। জিগ্‌গেস করলাম, বাঘে খাওয়া গরুটাকে পাতাটাতা চাপা দিয়ে রেখেছো তো? শকুন পড়লে কিন্তু বাঘ আর আসবে না। ও ঘাড় নাড়লে। তখন দশটা বাজে। ওকে বললাম, চল আমার সঙ্গে বাংলোতে। সেখানে বসে যা যা করা দরকার সেগুলো ভালো করে বুঝিয়ে দিলাম ওকে। আর বললাম গরুটা থেকে হাত পনেরো দূরে একটা ভাল গাছ দেখে মাচা বাঁধতে!

আমি তিনটের সময় যাব। নমস্কার করে ঝুমরু চলে গেল, আমি আমার আদরের ৩৭৫ ম্যানলিকারটাতে তেল দিতে বসলাম। চান-খাওয়া সেরে, ইজিচেয়ারে গড়িয়ে নিলাম একটু, তারপর কফির পাট সেরে দুটোর সময় বেরিয়ে পড়লাম রাইফেল আর হেডলাইটটা নিয়ে।

ঝুমরুর গাঁ-এর নাম তিন্‌তিরা। মাইল পাঁচেক পথ বাংলো থেকে। বৈশাখের খররৌদ্রে রুদ্র প্রকৃতিকে ভারী নিষ্ঠুরা মনে হয়, মনে হয় তার দেহে কিংবা মনে কোথাও নেই একটু কোমলতা। তিন্‌তিরা পৌঁছলাম যখন তখন তিনটে পাঁচ মিনিট। ঝুমরু, গান্তিয়া ও গাঁয়ের আরও লোকজন গরুটা দেখিয়ে দিলে আমায়। পাহাড় থেকে পাঁচশো গজ দূরে পড়ে রয়েছে গরুটা, ওর পিছনদিক থেকে কিছু মাংস খাওয়া। গান্তিয়ার ঘর সেখান থেকে শ'দুয়েক গজ হবে। বাঘ এসে গরু ধরতে ওরা সোরগোল তোলে, তাতেই শেষ অবধি জঙ্গলে আর নিতে পারেনি গরুটাকে। ওরা মাচা বেঁধেছে একটা শিমুলগাছে। গাছটা একেবারেই ন্যাড়া। শুক্লপক্ষের রাত, পূর্ণিমার কাছাকাছি, সন্ধে হতেই ফুটফুটে জ্যোৎস্না উঠবে চারদিকে। অমন জ্যোৎস্নায় ওই ন্যাড়া গাছে বসে আর যারই হোক চিতার দৃষ্টি এড়ানো অসম্ভব।

চারদিক ঘুরে দেখলাম। গান্তিয়ার ঘরের পিছন দিয়ে যে পাহাড়ি নালাটা গেছে তার পাশে একটি শিশুগাছ চোখে পড়ল, নিচটা ঝোপঝাড়ি ভরা।

ঠিক করলাম এ গাছের নীচেই বসব মাটিতে, ঝোপের আড়ালে। আমার অলিভ গ্রিন রং-এর পোশাক মিশে যাবে পাতার রং-এর সঙ্গে, চিতার চোখ এড়ানো যেতেও পারে হয়তো। গাছটাতে বসবার সুবিধে থাকলে গাছেই বসা যেত। কিন্তু সে গাছটি বড় ঝুপসী, তাতে বসে গুলি ছোঁড়ার সুবিধে হবে না। এদিকে অসুবিধে দাঁড়াল দুটো। গরুটি থেকে শিশুগাছটি প্রায় শ'খানেক হাত দূরে। রাতের বেলা অতদূর থেকে নির্ভুল এইম করা বেশ কঠিন হবে। তার উপর বাঘ যদি পাহাড় থেকে এ নালা দিয়েই নেমে আসে তবে একেবারে আমার ঘাড়ে এসে উঠবে। জানবার আগেই আমার অবস্থা ঐ গরুটার মতোই হবে। কিন্তু আর কোনও উপায় নেই, ঝুঁকি একটু নিতেই হবে। ওখানে বসাই ঠিক করলাম।

ততক্ষণে চারটে বেজে গেছে। আগুন রোদে কোমল লালিমা লেগেছে, সে লালিমা ছড়িয়ে পড়েছে আলোকঝারির বনে বনে আর পাহাড়ের মাথায়। ঝুমরুকে মাচাটা খুলে ফেলতে বলে, গাস্তিয়ার বাড়ি চিড়েভাজা আর চা দিয়ে বৈকালিক পর্ব্ব সমাধা করলাম।

তখন বেলা যায় যায়। গাঁয়ের লোকদের সন্ধের পর বাইরে বেরুতে, কথাবার্তা কইতে এবং আলো জ্বালাতে মানা করে দিয়ে বসলাম গিয়ে ঝোপের মধ্যে। নিজেকে লুকিয়ে রেখেও এইম নেবার সুবিধে পাচ্ছিলাম। সামনেটা বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। হেডলাইট সঙ্গে এনেছি, কিন্তু দরকার হবে বলে মনে হচ্ছে না। কাকজ্যোৎস্নায় চারদিক হেসে উঠেছে। চাঁদের মা বুড়ি সাদা ধব্‌ধবে চুল নিয়ে, তার চেয়েও সাদা তুলো পিঁজে চলেছে, আর সেই তুলো আলো হয়ে ঝরে পড়ছে রহস্যময়ীর আলোকঝারি পাহাড়ে পাহাড়ে, বনে বনে, পথে পথে। কেমন আমেজ লাগে এই মৃদুশীতল আলোর ঝরনাতে।

রাত এগিয়ে চলেছে, চিতার চিহ্ন নেই। তখন সাতটা। 'বৌ কথা কও' আর সেই নাম না-জানা খয়েরি রং-এর পাখিটা একটানা ডেকে চলেছে, আর পিছনের নালায় ঝিঁঝিঁদের কলস্বর। মাঝে মাঝে ভয় করছে বাঘ যদি পিছনের নালা দিয়ে আসে তবে করবার কিছু থাকবে না। নিরুপায় ভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে হিংস্র জন্তুর কাছে। হঠাৎ মনে হলো গরুটার কাছে একটা জানোয়ার দু'পায়ে ভর দিয়ে বসে আছে। সজাগ চোখে তাকালাম—একটা শিয়াল সুযোগের অপেক্ষা করছে। নুড়ি কুড়িয়ে দিলাম ছুঁড়ে—একলাফে সরে গেল শিয়ালটা। কেটে গেল আরও আধঘণ্টা। চেয়ে থাকতে থাকতে চোখ ব্যথা করে। এক এক মুহূর্ত মনে হয় যেন কতদিন।

এমন সময় পিছনের নালা থেকে একটা অদ্ভুত আওয়াজ পেলাম। উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম শব্দটার জন্য—আবার সেই শব্দ। শুয়োরের শব্দ। নালার শটী গাছের ঝাড়ে এসেছে লোভে লোভে। একটি নুড়ি গড়িয়ে দিলাম নালার গা দিয়ে। দ্রুত আওয়াজ তুলে শুয়োরটা ছুটে গেল পাহাড়ের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে বাঘের গুরুগম্ভীর ডাকে বন-পাহাড় চমকিত হয়ে উঠল। সর্ব্বনাশ বাঘ তাহলে নালা ধরেই এগিয়ে আসছিল, ভাগ্যে শুয়োরটা এসেছিল, নইলে—। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল। রাইফেলটাতে একবার হাত বুলিয়ে সামনে তাকালাম। ঐ তো পাহাড় থেকে বেরিয়ে এগিয়ে আসছে—যার জন্য আমার অপেক্ষা। একটু এগিয়ে আসে, আর দাঁড়িয়ে চারদিকে চায়—সন্দিগ্ধ চোখে, ঘর্ ঘর্ ঘর্ আওয়াজ করে একটা—সে আওয়াজে বিরক্তি পরিস্ফুট। নিঃশব্দে বসে আছি সামান্যতম নড়াচড়াও না করে, আমায় ওভাবে মাটিতে দেখতে পেলে কী করে বলা যায় না। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল চিতা, ধূর্ত চিতা, গায়ে চাকা চাকা দাগওয়ালা সেই ভয়ঙ্কর চিতা। গরুটার কাছে এসে চারপাশ একবার ঘুরলে, তারপর বাঘটা ঘাড়ের কাছ থেকে আরম্ভ করল খাওয়া। কিছুটা খায় আর চোখ তুলে চায়। দুর্গন্ধে বাতাস ভরে গেল। একটা চক্‌চক্ শব্দ হলো। মট্ করে হাড় ভাঙ্গার শব্দ হলো একবার। চাঁদের আলোয় রাইফেলের ফোরসাইট চিকচিক করছে। খুব সাবধানে রাইফেল তুলে যথাসম্ভব কম শব্দ করে আনসেফ করলাম রাইফেল। অতটুকু শব্দেই চিতা খাওয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর হঠাৎ একলাফে সরে গেল পিছনের ঝোপে। বোকার মতো বসে রইলাম কিছুক্ষণ—মিনিট দশেক হবে—আবার সেই ঘর্‌ঘরানি শব্দ, আবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে অতি সাবধানে এসে খাওয়া শুরু করলে চিতাটা—এবার পেটের কাছ থেকে। আবার রাইফেল তুললাম, নিঃশ্বাস বন্ধ করে ঘাড়ে এইম নিয়ে, নিঃশব্দে ট্রিগার চাপলাম। রাইফেলের বজ্রনির্ঘোষ ছড়িয়ে পড়ল, পাহাড়ে, বনে বনে, গাঁয়ের লোকের মনে মনে। আলোকঝারির চিতা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, আর উঠল না। একবার ডাকবারও সুযোগ পেল না সে।

তারপর নানান লোকের গলা, বাঁশ কাটার শব্দ, চা-এর পেয়ালার ঠুনঠুন, অন্দরে নারীকণ্ঠের হাস্যরোল, অবশেষে দীর্ঘ শোভাযাত্রা। চিতাটি লম্বায় সাড়ে সাতফুট ছিল। চিতা হিসাবে বিরাট। ওকে মারার পর শিশুগাছের নীচে দাঁড়িয়ে ওই জায়গাটাকে আমার আরও ভাল লেগেছিল—আরও মধুর, আরও সুন্দর, আরও বিচিত্র। ❑

আমি

এখন আমি বড়ো হয়েছি। এমনকী বলা চলে, বুড়োও হয়েছি। কিন্তু আমি যেমনটি ছিলাম তেমনই রইলাম। বদলালাম না একটুও।

ছেলেবেলায় আমার কেবলই আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করত। আজও করে। আমার দুই দাদাই পড়াশোনা খেলাধুলোতে আমার চেয়ে অনেকই ভালো ছিল। স্কুলের মাস্টারমশাইরা বলতেন, কী দাদাদের কী ভাই! ছ্যাঃ ছ্যাঃ। ভাবা যায় না।

বাবা বলত, হোন্দল, তুই কি অমানুষ হয়েই থাকবি চিরটাকাল? কোন

গুণটা তোর আছে, আমাকে বলতে পারিস? বড় জ্যাঠাইমা বলত, তুই ঘোষ পরিবারের একটা কুলাঙ্গার। তুই মরলে গুষ্টির উপকার। তা আমি এমনই হতভাগা ছিলাম যে না পারলাম "মানুষের মতো মানুষ" হতে, না পারলাম, মরতে। তাছাড়া এত যে গাল-মন্দ, ছিঃ ছিঃ করে, সে সব আমার গায়ে লাগত না। হাঁসের ডানায় জলের মতো গড়িয়ে যেত। যার বোধ-বুদ্ধিই নেই, তার কাছে প্রশংসা বা নিন্দামন্দ সবই সমান।

পড়াশোনা খেলাধুলা আমার কিছুই ভালো লাগত না। পেয়ারা গাছের কাঠবিড়ালির বাচ্চাদের সঙ্গে, বাগানের নাগচম্পা গাছের উঁচু ডালে বাসা করা ডাহুকদের বাচ্চাদের সঙ্গে, বাড়ির বাইরের মধুখালির প্রকাণ্ড বিলের পাশের দলদলি আর দাম-এর মধ্যে সল্লি হাঁসদের পাড়া ডিম কখন ফুটবে তার অপেক্ষাতে আমার দিন কাটত।

ফিনফিনে হলদে রং-এর ফড়িংরা মধুফুলের মধু চুষে যখন উড়ে যেত গোধুলিয়ার মাঠের দিকে তখন তাদের পেছন-পেছন দৌড়তে আমার ভারী ভালো লাগত। ভালো লাগত, হাঁসেদের ঘর খুলে তাদের শীতের সকালে তাড়িয়ে নিয়ে হরিসভার পুকুরপাড়ে গিয়ে দু-কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে একেক করে-করে দূর থেকে উড়ে ঝাঁপ দিয়ে ঝপাং-ঝপাং করে শীতের কুয়াশামাখা পুকুরের ঠান্ডা জলে তাদের আছড়ে পড়া দেখতে। জল ছিটকে উঠত তাদের জলে পড়াতে আর সকালের সোনা রোদ সেই অগণ্য জলকণাতে পড়তেই কোনও অদৃশ্য হাত হীরের টিয়ারা বুনত শূন্যে। সেই হাঁসেদেরই যখন সূর্যাস্তবেলাতে বিন্নিদিদি কুলো হাতে দাঁড়িয়ে ধান ছড়াতে-ছড়াতে ডাকত চই-চই-চই-চই করে, আর তারা যখন হেলতে-দুলতে প্যাঁক-প্যাঁক-প্যাঁক করে আমাদের বাড়ির দিকে একে-একে ফিরে আসত তখন মন ভরে যেত তাদের দেখে। যে-কথা বললে কেউই বিশ্বাস করত না, তাই কারোকেই বলা হয়নি আজ অবধি সে কথা। সকালে হাঁসেদের হরিসভার পুকুরপাড়ে ছেড়ে দিয়ে খুব জোরে যখন দৌড়ে বাড়ির দিকে ফিরে যেতাম তখন আমি আসলে দৌড়তাম না, উড়তাম। সত্যিই উড়তাম। মাটি থেকে অনেক ওপর দিয়ে উড়ে যেতাম—আমার খালি পা দুটো টি-টি পাখির পায়ের মতো দুলতে-দুলতে চলত আমার শরীরের নীচে-নীচে।

এই সবই করতাম কিন্তু পড়াশোনা করতাম না। আদিগন্ত নীল আকাশ, মধুখালির বিলের সব্‌জেটে জলের বিস্তীর্ণ চাদর। এই সবই ছিল আমার জগৎ।

দাদা হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষাতে সপ্তম হল। কলকাতাতে গিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হল। মামাবাড়িতে থেকে পড়াশোনা করবে ঠিক করল। আমার মামারা বালিগঞ্জে থাকতেন। মামা খুব বড়ো উকিল ছিলেন। খুব ভালো অবস্থা। দাদা পরে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বিদেশে আরও ডিগ্রি নিতে চলে গেল। প্রথমে গেল বার্মিংহাম-এ। তারপর সেখান থেকে ইউনাইটেড স্টেটস-এ। মাঝে একবার দেশে ফিরেছিল। তারপর বস্টনেই থিতু হল। একজন ফরাসি মেয়ে বিয়ে করে গ্রিনকার্ড হোল্ডার হয়ে আমেরিকাতেই থেকে গেল।

মেজদাও হায়ার সেকেণ্ডারিতে স্ট্যাণ্ড করল। তবে দাদার মতো অত ভালো ছিল না সে। উনিশ না কুড়ি কী যেন হয়েছিল। তারপর মেজদাও ডাক্তারি পাশ করে আরও বড় চোখের ডাক্তার হতে অস্ট্রেলিয়াতে চলে গেল। তারপরই বাবার ব্যাবসা খুবই খারাপ হয়ে গেল। শরীরও খারাপ। মায়ের কিডনি ড্যামেজ হয়ে গেছে। প্রতি সপ্তাহে ডায়ালিসিস করতে সদরে যেতে হয়। সেখানে হাসপাতাল ও ডাক্তারের সুবিধা তেমন নেই। আমি তখন ক্লাস নাইনে পড়ি। মায়ের চিকিৎসার সুবিধার জন্যেই আমাদের হরিনাথপুরের বাড়ি, সমস্ত ধান-জমি, আমবাগান পুকুর-টুকুর সব বিক্রি করে দিয়ে বাবা কলকাতার ভবানীপুরে একটি ছোটো বাড়ি কিনে যা কিছু নগদ পেয়েছিলেন সব নিয়ে কলকাতাতে চলে এলেন।

বড়দা ও মেজদা আমার চেয়ে আট এবং সাত বছরের বড়ো। বড়দা তো আমেরিকাতে সেটল করেই গেছে মেজদাও পড়াশোনা শেষ করে এনেছে অস্ট্রেলিয়াতে। হাবে ভাবে বোঝা যাচ্ছে যে সেও আর দেশে ফিরবে না। ততদিনে অতি বাজে সেকেণ্ড ডিভিশানে হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করে কোনোক্রমে ভূগোল নিয়ে ভর্তি হয়েছি আশুতোষ কলেজে। বাবার রোজগার কিছু নেই। সঞ্চয় ভাঙিয়ে মায়ের চিকিৎসা আর সংসার খরচ চলছে।

অতি নিকৃষ্ট ফল করে কোনওক্রমে কলেজের গণ্ডি পেরোলাম। আমাকে তো ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি ডেকে নিয়ে চাকরি দেবে না। এখন বিজ্ঞান, অ্যাকাউন্টেসি আর কম্পুট্যারের যুগ। ভূগোল নিয়ে যাচ্ছেতাই ভাবে পাশ করা ছেলেকে কে চাকরি দেবে?

ততদিনে বড়োমামা একদিন ম্যাসিভ স্ট্রোকে চলে গেলেন। উনি থাকতে উনিই বাবার পরামর্শদাতা ছিলেন। আমার ধারণা বাবাকে না-জানিয়ে উনি মাকে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্যও করতেন। বড়োমামার ছেলে ছিল না।

এক মেয়ে—ছবিদি। যে পাশের বাড়ির একটা বকাছেলেকে বিয়ে করে বড়ো দুঃখী জীবনযাপন করছিল। বড়োমামি তো আগেই গত হয়েছেন। জিতু জামাইবাবু দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন। কিন্তু তিনিও শ্বশুরের সম্পত্তি ভাঙিয়েই দিন চালাতেন। তাছাড়া খুব মদ খেতেন, ছবিদিকে মারধরও করতেন।

ওই পরিস্থিতিতে আমার আত্মহত্যা করার ইচ্ছেটা আরও তীব্র হল। কিন্তু আমার এক বকাবন্ধু ছিল। জগত। আশুতোষ কলেজে পড়ত কিন্তু ফার্স্ট ইয়ারেই পড়া ছেড়ে দেয়। যদুবাবুর বাজারের পাশের গলিতে সে একটি ছিটকাপড়ের দোকান করে আর মির্জাপুরের এক মুসলমান দর্জির কাছ থেকে জামাপ্যান্ট এর কাপড় কাটতে আর সেলাই করতে শিখে নেয়। তার দোকান এখন রমরমিয়ে চলে। জগত কলেজ ছাড়লেও আমার সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রেখেছিল। মাঝে-মাঝেই পূর্ণ বা ইন্দিরা বা বিজলিতে সিনেমা দেখাত। মা-বাবার কাছেও আসত। খুব হাসাতে পারত ও সকলকে। অত যন্ত্রণার মধ্যে মার মুখে হাসি ফুটে উঠত। মা বলতেন, জগত, তুমি আবার এসো বাবা।

একটা নতুন কিডনির দাম অনেক টাকা। জমিজমা বিক্রি করার পরই বাবা যদি মায়ের জন্যে কিডনি কিনে দিতেন একটা তাহলেও হতো। আজকে সেই সামর্থ্য কোথায়? জগতই মা-বাবাকে বলেছিল,আমি আর হোন্দল একটা করে কিডনি দিলেই তো ল্যাটা চুকে যায়।

বাবা রাজি হননি। বলেছিলেন, তোমার মাসিমা আর আমি আর ক'দিন বাঁচব? দুজনেই তো সত্তর পার করে দিয়েছি। তোমাদের সামনে সুন্দর জীবন—দীর্ঘ জীবন—তোমাদের এই শাস্তি দিতে পারি না আমরা।

এদিকে আমাদেরও আর চলে না। বাবার পুঁজি সব শেষ। এবারে মায়ের গয়না ভাঙা শুরু হল। আমি, এই হোন্দল এমনই অপদার্থ যে বাবা-মায়ের জন্যে কিছুমাত্রও করতে পারি না। বাবা ঠিকই বলেছিলেন, দাদারা কত ভালো আর আমি একটা অমানুষ।

বাড়ির একতলাটা একটা গুজরাটি পরিবারকে ভাড়া দিয়েছেন বাবা। তাও মাস ছয়েক হল। তাদের কেবলই ধান্দা বাড়িটা কিনে নিয়ে আমাদের উদ্বাস্তু করার। সবসময়ে থেকে টাকার লোভ দেখাচ্ছে তারা বাবাকে। এমন সময়ে এক রবিবারে জগত এসে বলল, কাল সারা রাত ভেবে-ভেবে একটা প্ল্যান এসেছে মাথাতে।

কী প্ল্যান?

তোদের গ্যারাজটা তো ফাঁকা পড়ে আছে। ভাগ্যিস ভাড়াটেকে দিয়ে দেননি মেসোমশাই।

ওরা তো গাড়ি পাশের প্যাসেজে রাখে। তিনটে গাড়ি ওদের। পয়সার অভাব তো নেই। আগে একটা ছিল। গত ছ'মাসে আরও দুটো কিনেছে।

সে যাই হোক, তোদের বাড়িটার লোকেশানটা খুবই ভালো। এখানে ঢোকলা, চানাচুর, গজা এসবের দোকান করলে খুব চলবে। এ ব্যবসাতে কত প্রফিট জানিস? সত্তর পার্সেন্ট।

তারপর বাবাকে বলল, মেসোমশাই বিজলি সিনেমার পাশে এক চিলতে একটা দোকানে গরম-গরম চানাচুর ভাজছে একটা লোক গত পঞ্চাশ বছর হল। সে আজ নিজে হয়তো ভাজছে না, তার নাতিপুতি ভাজছে হয়তো। কিন্তু সেই দোকান থেকে সে লক্ষলক্ষ টাকা রোজগার করেছে এবং আজও করছে। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী এই কথাটা তো বাঙালি ওই লোকটাকে দেখেও শিখতে পারত।

আমি বললাম, বাণিজ্য তো করব, ক্যাপিট্যাল আসবে কোত্থেকে?

জগত বলল, এই কথাটা যা বললি এর তুলনা নেই। সব বাঙালির এক রা। "হোয়্যার, দেয়ার ইজ আ উইল দেয়ার ইজ আ ওয়ে।" টাকার দরকার হলে কাবলিওয়ালার কাছ থেকে ধার করবি। আর কিছুটা আমি দেব। দেখিস তুই! একমাসে তোর দোকান দাঁড়িয়ে যাবে। চক্রবেড়িয়ার একটা দোকান থেকে দুটো ছোঁড়াকে ভাগিয়ে আনব। তাদের মোটা অ্যাডভান্স দিয়ে দিয়েছি। ওরাই তো কারিগর।

দোকানের নাম কী দিবি?

কেন? হোন্দল কুতকুত। দেখবি, নামেই কেল্লাফতে হয়ে যাবে।

২

সেদিন জগতকে বাস স্টপ পর্যন্ত এগিয়ে দিতে যখন যাই, জগত বলল, হোন্দল, তোকে একটা কথা জিগ্যেস করব, কিছু মনে করিস না। অত্যন্ত পার্সোনাল কথা।

কী কথা। বল?

তোর দুই দাদা এত কৃতী, এত বড়লোক। মাসিমার অসুখ এবং তোদের অবস্থার কথা কি তাঁরা জানেন না?

আমি মুখ নিচু করে বললাম, জানেন।

তবে?

দ'দাদের অনেক খরচ। একজনের ফ্রেঞ্চ বউ অন্যজনের ইংলিশ। তারা হরিনাথপুরের অতি সাধারণ শিক্ষিত চাষা আমার বাবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চায় না। আমাকে বড়দা একবার লিখেছিল, তোকে একটা অটো কিনে দিতে পারি। বাবাকেও। কিন্তু খেটে খেতে হবে। মাঝে-মাঝে অনুদান দিতে পারব না। মেজদা চলে যাওয়ার পরে আর যোগাযোগ রাখেনি মা-বাবার সঙ্গে। আমাকে একটি চিঠিতে লিখেছিল, তোদের কম্পিউটার নেই। ই-মেইল ছাড়া আজকাল কি যোগাযোগ করা সম্ভব। বরং ইন্টারন্যাশনাল রোমিং মোবাইল ফোন নিয়ে নে একটা।

সত্যি। মোবাইল তো আজকাল পানওয়ালা বিড়িওয়ালার কাছেও আছে। নিস না কেন একটা?

আমাদের তো ল্যাণ্ড লাইনই নেই। কী দরকার। ওসব তোদের মতো কাজের মানুষদের দরকার। প্রয়োজন বাড়ালেই বাড়ে।

সেই রাতেই মায়ের অবস্থা খুব খারাপ হল। পাড়ার হরেন ডাক্তারকে ডেকে আনলাম গিয়ে। বললেন, এখনই নার্সিংহোম-এ রিমুভ করুন। মেডিক্লেইম করা আছে কি?

না তো।

তবে হাজার পঞ্চাশেক টাকার বন্দোবস্ত করুন। নইলে নার্সিংহোম ভর্তি করবে না।

তারপর বললেন, কোনও এম.এল.এ-র সঙ্গে জানাশোনা আছে? তা না হলে সরকারি হাসপাতালেও ভর্তি করে নেবে না।

আমার মুখে এসে গেল, তাহলে কি গরিব বিনা চিকিৎসাতে মরবে এই জনদরদী রাজ্যে?

গরিব চিরদিনই বিনা চিকিৎসাতে মরেছে। কংগ্রেসি আমলেও মরেছে, লাল আমলেও মরছে। কোনওদিন যদি গৈরিক আমল আসে তখনও মরবে। জনতার প্রতি দরদ এসব মুখের কথা। কথার কথা। নির্বাচনের আগের বুলি।

মা রাত পৌনে দুটোর সময়ে মারা গেলেন। পাড়ার মোড়ের ফোন বুথ থেকে আগে জগতকে একটা ফোন করলাম। অত রাতে বিরক্ত করার মতো আপনজন আমার আর কেউই ছিল না। তারপর সকালবেলা বড়োমামার উপহার দেওয়া সোনার টিসর্ট হাতঘড়িটি বিক্রি করে যে টাকা পেয়েছিলাম তা দিয়ে বড়দা ও মেজদাকে আই এস ডি কল করলাম।

দাদা বলল, মরবার আর সময় পেল না? এ সপ্তাহের শেষে আমার একটা খুবই ইম্পট্যান্ট প্রেজেন্টেশান আছে আমার পক্ষে পনেরো দিনের আগে দেশে যাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া, গিয়ে হবেটাই বা কী? মা তো মরেই গেছে।

তারপর বলল, টাকা-পয়সার দরকার আছে তো বল। কিছু ডলার পাঠাবার বন্দোবস্ত করছি।

বললাম, না, না, তোমার টাকা পাঠাতে হবে না। হয়ে যাবে।

মেজদার ফোন বেজে গেল অনেকক্ষণ। হয় বাড়িতে কেউ নেই, দুজনেই কাজে গেছে। তারপর ভয়েস মেইল-এ শোনা গেল যে ওরা হলিডেতে গেছে ইন্দোনেশিয়াতে। পনেরো দিন পরে ফিরবে। এমন করে ইংরেজি বলে ওরা যে বাংলা মিডিয়াম স্কুলে পড়া আমার পক্ষে বোঝাই সম্ভব হয় না।

বাড়ি ফিরে দেখলাম জগত এসে গেছে। খুব রাগ করল আমার ওপরে।

যে হাসপাতালে ডায়ালিসিস করা হচ্ছিল সেখানে নিয়ে যাওয়া অবশ্যই উচিত ছিল। আমাকে জানালে আমি টাকা নিয়ে আসতাম।

বাবা বললেন, তুমি আর কত করবে বাবা। তুমি তো আমার কেউ নও। আমার দু-দুজন পরম মানুষ ছেলে। আর ও-ই একটা অমানুষ। তারাই যদি কিছু না করে, না করতে পারে, তুমি কী করবে।

জগত বলল, আমি গিয়ে গুরুদোয়ারাতে ফোন করে দিচ্ছি। কাল সকাল ন'টাতে কাচের গাড়ি পাঠাবে।

আমি ওকে ছবিদির নম্বরটা দিয়ে বললাম; ভোর পাঁচটা নাগাদ খবরটা দিস। যদি আসে। মায়ের শাড়ি-টাড়িও তো বদলাতে হবে।

জগত বলল, আমি মাকে নিয়ে চলে আসব ছ'টার সময়ে। ফুল, ধূপকাঠি, মালা এ সব নিয়ে।

তারপর বলল, এই কলকাতাটা বাংলারই রাজধানী। কিন্তু দ্যাখ আমরা জন্মাই কোনও মাড়োয়ারি হাসপাতালে। লেখাপড়া করি গুজরাটিদের ভবানীপুরের স্কুলে বা মাড়োয়ারিদের হিন্দি হাইস্কুলে। অসুখ হলে যাই বেলভিউ অথবা বিড়লা হার্ট সেন্টারে। ছেলের অন্নপ্রাশন দিই মহারাষ্ট্র নিবাস অথবা মাইসোর হল-এ, মেয়ের বিয়ে দিই ত্যাগরাজা হল-এ অথবা পাঞ্জাব ভবনে। আর মরে গেলে সর্দারজিদের গুরুদোয়ারার শববাহী গাড়িতে শ্মশানে যাই। আমাদের জবাব নেই, সত্যি।

জগত চলে গেলে আমি মায়ের পায়ের কাছে বসে থাকলাম মায়ের মুখের দিকে চেয়ে।

বাবা নিজের মনে বললেন, ভালোই গেছেন। এই বাঁচা কি বাঁচা ছিল!

তারপর বললেন, বড়ো ও মেজোকে কি খবর দিয়েছিলি?

বাবাকে মিথ্যে বললাম আমি। বললাম ওদের কেউই নেই। দুজনেই অফিসের কাজে বাইরে গেছে।

আর বউমারা?

তারাও তো কাজে থাকেন।

অত দুঃখেও হাসি পেল আমার। যাঁদের চোখে দেখেননি, ফোটো দেখেছেন। শুধু তাদেরও বউমা বলে আনন্দ পাচ্ছেন।

পাখাটা মাথার ওপরে ঘুরছিল শব্দ করে। একটা ঝোড়ো হাওয়া উঠল। মুচমুচ শব্দ তুলে পথের পাতা-পুতি, কাগজের ঠোঙা ধুলোকে ঝাঁট দিয়ে নিয়ে গেল সেই হাওয়া। নিশুতি রাতের পথে কারা যেন টেম্পো করে "বলহরি হরিবোল" ধ্বনি দিতে-দিতে উল্লাস করতে- করতে মৃতদেহ নিয়ে গেল কেওড়াতলার দিকে। আমি সেই অদেখা-অচেনা মৃতর উদ্দেশ্যে দুটি হাত অভ্যাসবশে জড়ো করলাম বুকের কাছে।

বাবা—মায়ের চেয়ে আট বছরের বড়ো। বাবারও দিন ফুরিয়ে এসেছে। মা চলে যাওয়াতে তার বাঁচার ইচ্ছেও আর বোধহয় রইল না।

হঠাৎ বাবা বললেন, একটু কেশে নিয়ে, বুঝলি হোন্দল, তোকে আমি চিরদিনই অমানুষ বলে এসেছি। আজকে বলছি, না, তুই-ই আমার সন্তানদের মধ্যে একমাত্র মানুষ।

তারপর বললেন, জগতের সঙ্গে ব্যাবসাটা তুই শুরু কর। তারপর বিয়ে কর। আমি নাতি-পুতি না দেখে মরছি না, যম আমাকে যতই ডাকুক।

বাবার কথাতে আমার দু-চোখ বেয়ে জলের ধারা নামল। ❑

গাড্ডী লাজোয়াব

শিকারের প্রথম পর্যায়ে আর্থিক অসাচ্ছল্য বড়ই পীড়া দিত। তখন ইয়ার-দোস্ত সকলেই ছাত্র। রোজগার-টোজগার কারোরই নেই। সামান্য হাতখরচা সম্বল। সাতদিন হাজারীবাগে বেড়িয়ে আসার জন্যে হয়ত একশ টাকা বরাদ্দ হল। তাতে সাধামাঠা বায়ু পরিবর্তন হলেও বা হতো ; কিন্তু সাতদিনের শিকারের খরচ উঠত না।

হাজারীবাগে গোপালদের বাড়ি ছিল এবং শিকারের যাত্রাপার্টি ছিল আমাদের। সুতরাং সময় হলেই ইয়ার-দোস্ত মিলে সেখানেই বেশি যাওয়া হতো।

গোপালের অর্ডার ছিল দুবেলা খিচুড়ি। চমনলাল ভাগ্যে কানে ভাল শুনত না নইলে, নিজেরাই খিচুড়ির ফরমায়েশ দিয়ে নিজেরাই খেতে বসে যখন খিচুড়ির মুণ্ডপাত করতাম তখন পাচকের পক্ষে ক্রোধান্বিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল।

জঙ্গলে পায়দল্ মেরে যেতে হলে, যেতে যেতেই সাতদিন খতম। তাই হুসেনের উনিশ'শ বত্রিশ মডেলের ফোর্ডোয়া গাড়ি ভাড়া করতে হত। আয়েসী জমিদারের মতো গাড়িটা সারাদিন শুয়ে শুয়ে মসজিদের পাশের গলিতে ঘুমুতো। রাতের সফরের অপেক্ষায় দম নিত। এক রাতের শিকারের নেশায় হুসেনের গাড়িরই মত আমাদেরও দম ফুরিয়ে আসত শারীরিক এবং আর্থিক।

খিচুড়ির সঙ্গে খাবার জন্যে মুরগি মারার আশায়, বিকেলে কোসমা গেলাম একদিন। সন্ধে হবার আগেই হাঁকা করতেই এক ধাড়ী-কচি-মাদী-মদ্দায় ভরপুর শুয়োরের দলের সঙ্গে দেখা। দে-দনাদ্দন্ করে গোটা চারেককে ভূতলশায়ী করা হল। কাড়ুয়া মহানন্দে গ্রামসুদ্ধ লোককে ফিস্টিতে নেমতন্ন করে বসতেই যাচ্ছিল একটু হলে, এমন সময় ভুতো-পার্টি স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশান নিল। বলল : পাঞ্জাবি হোটেল সব শুয়োর বিক্রি করব।

আমরা ছ্যাঃ ছ্যাঃ করে উঠলাম। ভদ্রলোকের ছেলে, সখের জন্যে শিকার করতে আশা। শিকার-করা- শুয়োর বিক্রি করবে কি! হ্যাম হবে, বেকন হবে, নদনদে চর্বিভরা পর্ক চপ হবে, আর এ বলে কিনা শুয়োর বিক্রি করবে?

গোপাল উত্তেজিত হয়ে বলল, যা যা—জানো, রামচন্দ্র বন্যাবরাহ মেরে খেতেন?

হাতমুখ ধুয়ে বারান্দায় বসে আমরা কফি খাচ্ছি এমন সময় দেখি সত্যিই আধ ডজন পাঞ্জাবি হোটেলওয়ালা হাঁটুর উপর লুঙ্গি তুলে টর্চলাইট জ্বেলে শুয়োর চারটেকে উল্টে-পাল্টে পরখ করছে আর ভুতো পাশে দাঁড়িয়ে নিউমার্কেটের দোকানদারদের মতো হিগলিং করছে।

তারপর কি হল জানি না। ভুতো কত টাকা পকেটস্থ করল তাও না, গোপালের সামনে এসে একটা কর্‌করে একশো টাকার নোট নেড়ে বলল, আত্মনির্ভর হতে শিখুন।

এইরকম নানা জনে নানা তর্কাতর্কি হতে হতে দেখলাম হাজারীবাগে পৌঁছে গেছি।

গাড়ি ভাড়ার খরচা তোলার জন্যে আমাদের নিরুপায় হয়েই এইরকম

বর্বরোচিত ন্যক্কারজনক ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে সম্মত হতে হল। সেইদিন আমরা যে কজন সেখানে উপস্থিত ছিলাম, দাঁতে-দাঁত চেপে প্রতিজ্ঞা করলাম যে, বড় হয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করে গাড়ি আমাদের কিনতেই হবে। নইলে, গাড়ির জন্যে এতবড় হেনস্তা আর সহ্য হয় না।

সেই শিকার পর্বর পর কোলকাতা ফিরে এসে নাজিম মিঞার চিঠি পেলাম 'ম্যায় গাড্ডী মুলায়া'। আপনাদের চিন্তার আর কোনো কারণ নেই। দয়া করে আপনারা এখন এসে পৌছুলেই হয়। জঙ্গলে যাবার কোনো পরোয়া নেই এবারে। খালি জঙ্গলে যাও আর ঘোড়া দাবো। তারপর যথারীতি—গোলি অন্দর, জান্ বাহার।

খবরটা শুনে গোপাল একবার সরেজমিনে তদন্ত করতে গেল। ফিরে এসে রিপোর্ট দিল, কুল্লে পাঁচশ টাকায় ড্রাইভারসুদ্ধ এক খানদানি শেভ্রলে গাড়ি কিনেছেন নাজিমসাহেব। টায়ার-খোলা অবস্থায় ইটের উপরে বসানো দেখে এসেছে স্বচক্ষে গাড়িকে।

নাজিমসাহেব বলেছেন, আমরা এলে গাড়ির উপর খুবই ধকল্ যাবে, সেইজন্যে গাড়ি এখন পারফেক্ট রেস্টে আছে।

গোপাল বলল, ড্রাইভারকে দেখতে অবিকল গাড়ির শক্-অ্যাব্সর্বারের মতো। একদম কথা বলে না। তার গাড়ির সমসাময়িক একটা পাৎলুন পরে রোয়াকের ছাগলের নাদি পরিষ্কার করে আর নির্লিপ্তভাবে নিশিদিন গাঁজা খায়।

গাড়ি যখন নাজিমসাহেব কিনেছেন তখন শিকারে যেতেই হয়। অতএব আমাদের আবার দেখা গেল অকুস্থলে।

যেতেই, উদ্বাহু হয়ে নাজিম সাহেব আদাব্ আদাব্ করে বকরী ঈদের নেমতন্ন করলেন। সে দুপুরে ত আমরা তন্দুরী রোটী আর চাঁব খেয়ে ফিরে এলাম। নাজিমসাহেবের গাড়ি দেখা হল না। পাকা দেখার আগে যেমন করে অনেকে সরময়দা মালিশ হয়, গাড়ি বোধহয় তেমনিই মালিশ হচ্ছে নেপথ্যে!

ঠিক সন্ধে সাতটায় এসে উনি আমাদের তুলে নেবেন বললেন। বললেন, আপলোক বে-ফিক্কর্-রহিয়ে। ইয়ে গাড়ি নহী পংখীরাজ হ্যায়।

সন্ধে হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ধড়াচূড়া পরে বসে রইলাম। রিফর্মেটরীর মাঠে তিতিরগুলো কেঁদে কেঁদে থেমে গেল। সিঁদুর গ্রামের মেয়েরা হলুদ শাড়ি পরে বাজার সেরে কল্কলিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। অন্ধকার হয়ে গেল।

সাতটা বেজে আটটা বাজল। আটটা বেজে নটা বাজল। কোথায় নাজিমসাহেব? আর কোথায় তাঁর গাড়ি?

শেষে, রেগেমেগে চমনলালকে খিচুড়ির অর্ডার দিয়ে গোপাল জুতো খুলতে বসল। ভুতো বসবার ঘরের বড় শোফাটাতে কুকুরকুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিল আলোয়ান মুড়ে। এমন সময় হঠাৎ একটা অশ্রুতপূর্ব গগননিনাদি আওয়াজ কানে এল আমাদের সকলের। ভুতো ঘাবড়ে গিয়ে তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠল। গোপালের জুতোর ফিতে ছিঁড়ে গেল।

জংলী মোরগকে অ্যামপ্লিফায়ারের সামনে বসিয়ে দিলে যেমন আওয়াজ হয় তেমনি আওয়াজ হাজারীবাগের এ সম্ভ্রান্ত, নিস্তব্ধ পাড়াকে সচকিত করে আমাদেরও হক্‌চকিয়ে দিল।

কঁ কর্—কঁর-র-র-র—কঁ'র্-কঁর্-র-র-র। ভুতো দৌড়ে গিয়ে বারান্দা থেকে চেঁচাল, গাড়ি এসেছে, গাড়ি এসেছে! আমরা ঊর্ধ্বশ্বাসে বাইরে এলাম। তখন গাড়ি ব্যাক্ করে তার মুখ সোজা করছে ড্রাইভার, আর নাজিমসাহেব গর্বিতভাবে দাঁড়িয়ে আছেন।

ঘড়্ ঘড়্ ঘড়্, ধর্ ফর্ ফর্ ঘড়র্ ঘড়্ করে একটা ঘোরতর দীর্ঘশ্বাস বেরতে লাগল গাড়ি থেকে। গাড়ির মুখ আমাদের বিপরীত দিকে যেতেই দেখি সাইলেন্সার পাইপ দিয়ে দুর্বাসা মুনির চোখের আগুনের মতো আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। কেন জানি আমার হঠাৎ মনে হল, সেই শুয়োরগুলোর প্রেতাত্মা এই গাড়ি হয়ে আমাদের উপর শোধ নিতে এসেছে। এই ঘড়্-ঘড়্-ফর্ ফর্ তাদেরই সম্মিলিত মৃত্যুকালীন দীর্ঘশ্বাস!

নাজিমসাহেব আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ, সমাহিত অবস্থা থেকে ঘুম ভাঙিয়ে বললেন, আরে উঠিয়ে উঠিয়ে, কেয়া লড়প্পনবাজী হো রহা হ্যায়, বেকার। দের হো গ্যয়া বহতই।

আমরা সকলে উঠে বসলাম। নির্বাক ড্রাইভার একবার মুখ ঘুরিয়ে আমাদের দেখল। অন্ধকারেও বুঝলাম, গাঁজার নেশায় চোখ দুটো খাটাসের চোখের মত লাল হয়ে রয়েছে।

গাড়ি, শহর পেরোতেই গতি বাড়ল তার। আর আমরা বিনি পয়সায় জার্মান সিম্ফনি অর্কেষ্ট্রা শুনতে লাগলাম। খটা খট্—ঝটা ঝট্ কুর্-কুর্ খুর্-খুর্—হাঁকো পাঁকো—হাঁকো-পাঁকো-টুঙ্-টুঙ্-টুঙ, টুঙ্-টুঙ্-টুঙ্, টুঙ্-টুঙ। মাঝে মাঝেই ঘুমন্ত দেহাতী গ্রামবাসীদের হার্টফেল করিয়ে মারবার জন্যে কঁর্-র্-র্-র্ ; কঁর্ র্-র্-র্ করে হর্ণ বাজাতে লাগল শুদ্ধ নিতে।

আমাদের কারো পশ্চাৎদেশই তেমন পেলব ও কোমল নয়। কিন্তু তবুও মনে হতে লাগল গাড়ির পিছনের সিটটি মোটেই সুখপ্রদ নয়। ভাল করে উঠে ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেট করতে গিয়ে দেখি, সিট বলে কিছুই নেই। উঠতে গিয়েই আমার সাধের ব্যারেথিয়ার শিকারের ট্রাউজারের এক গিরে কাপড় দেখি ছিঁড়ে সিটে লেগে রইল। দুখানি পাকানো বড় বড় স্প্রিং। তার উপর সুন্দরভাবে চারখানি আনন্দবাজার গঁদের আঠা দিয়ে সাঁটা।

ভুতো আর নাজিমসাহেব সামনে বসেছে। গাড়ি এখন টুটিলাওয়ার পথে বেগে চলেছে। রাস্তাটা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এবং সমস্ত রাস্তাটা পাথুরে এবং করোগেটেড্। কত যে আওয়াজ হচ্ছে গাড়ি থেকে তা আর কি বলব। একটা জিনিস লক্ষ্য করছি, গাড়ির ঢিলে-ঢালা হাঁড়ির সাইজের হেডলাইট দুটোর আলো একবার গাছে, একবার রাস্তায়, একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে পড়ছে।

ভুতো নাজিমসাহেবকে শুধোলো, এমন হচ্ছে কেন?

নাজিমসাহেব বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, আরে! খানদানি গাড়িকি এহি ত মজা! ইস্‌কো অটোমেটিক স্পটিং কহা যাতা হ্যায়। যারা রাতে স্পট লাইট ফেলে শিকার করে এই বন্দোবস্ত তাদেরই জন্যে। হেডলাইট একবার অন্তরীক্ষে, একবার স্থলে, একবার নৈঋতে, একবার ঈশানে অটোমেটিক্যালি ঘুরে যাচ্ছে, জানোয়ার দেখো আর ইতমিনানসে মারো।

ভুতো আমার ঠিক সামনে বসে আছে। কিন্তু আমার কেবলি মনে হচ্ছে ওর মাথাটা একবার উঁচু হচ্ছে, আর একবার নীচু হচ্ছে। অথচ এক গাড়িতেই চেপে যাচ্ছি। এ কি করে সম্ভব? আমার মাথা উঁচু হচ্ছে না অথচ ওর মাথা উঁচু হচ্ছে!

প্রথমে নিজে অনেক ভেবে ভেবে দেখলাম কি কি বৈজ্ঞানিক কারণে এরকম হতে পারে। কিন্তু এ যন্ত্রযানে চেপে ঐ শব্দলহরীর মধ্যে মাথা কাজ কচ্ছিলো না।

এমন সময় হঠাৎ "ইয়া আল্লা" বলে ড্রাইভার সাহেব তড়াক্ করে দুপায়ে সিটের উপর লাফিয়ে উঠল এবং তারপরে দু হাত এবং দু'পায়ে স্টিয়ারিংটাকে জড়িয়ে ধরল।

কাঠের স্টিয়ারিং। সে গাড়ির কাঠের স্পোক। কাঠে অত ভার সইবে কেন? ঘ্যাটাং করে স্টিয়াংরি-এর দুটো ডাণ্ডা ভেঙে গেল এবং প্রায় যুগপৎ তিনটে নেংটি ইঁদুর ড্রাইভারের সিটের তলা থেকে লাফিয়ে ভুতোর মাথাকে স্পিং-বোর্ড করে আমার কাঁধ টপ্‌কে রাস্তায় বডি থ্রো দিল।

এদিকে গাড়ির বেগ তখনো কমেনি। রাস্তাটা ঢালু হয়ে একটা সরু পাহাড়ী নদীর কজ্‌ওয়ের উপর দিয়ে গড়িয়ে গেছে দেখলাম। তারপর আর ভাববার সময় ছিল না। দেখলাম, দিব্য চক্ষে দেখলাম, কেওড়াতলায় শুয়ে আছি আর গুঁফো ডোমটি বাঁশ দিয়ে আমাকে খোঁচাচ্ছে।

এসে গেল, এসে গেল, মরণরে তুহুঁ মম শ্যাম সমান! এমন সময় ভুতো ওর সমস্ত শরীরের সের পনেরো ভার নিয়ে গাড়ির ব্রেকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এবং গাড়িটা একটা প্রচণ্ড আর্তনাদ করে কজওয়ে ডিঙিয়ে নদীতে গিয়ে পড়ল।

অথচ দেখলাম, আমরা কেউই মরিনি।

গাড়ি চলচ্ছক্তিহীন হবার সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার সাহাব মর গিয়া বলে এক লাফে নদীর বালির উপর গিয়ে পড়লেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পাৎলুনের মধ্যে থেকে একটি নেংটি ইঁদুর তিড়িং করে বেরিয়ে ফুরুৎ করে পালিয়ে গেল।

আমরা তখন অতিকষ্টে গাড়ির বাইরে এলাম এক এক করে। ভুতোকে ফিস্‌ফিসিয়ে শুধোলাম, এই— তোমার মাথা একবার উঁচু, একবার নিচু হচ্ছিল কেন?

ভুতো কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর ভূত দেখার মতো, হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

আমি জোর গলায় বললাম, আমি মরিনি।

তখন ভুতো ওর পকেট থেকে এক ব্যাটারির একটা টর্চ বের করে এগিয়ে গিয়ে গাড়ির বাঁদিকের সামনের টায়ারে আলো ফেলল। দুজনেই দেখলাম, একটি তিন ইঞ্চি বাই চার ইঞ্চি (প্রস্থে এক ইঞ্চি) টায়ারের টুকরো পরিচ্ছন্নভাবে অরিজিনাল টায়ারের উপর পেরেক দিয়ে মারা আছে। কাঠের রিম, কাঠের স্পোক, অতএব পেরেক মারতে কোনোই অসুবিধা হয়নি।

আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি, এমন সময় নাজিমসাহেব বকনা বাছুরের মতো নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, শালা বেইমান্।

ভুতো বলল, এমন গাড়ি কিনলেন কেন?

নাজিমসাহেব ধমক দিয়ে বললেন, গাড়িকো কেয়া কসুর? শালে ড্রাইভার বেইমান্! ❑

দুর্গাদের কথা

যেখানকার কথা বলছি এখন সেখানে সাতকোশিয়া গণ্ড অভয়ারন্য। ওড়িশার মহানদী চোদ্দমাইল প্রবাহিত হয়েছে একটি সুগভীর গিরিখাত দিয়ে। সেই খাতটির দৈর্ঘ্য চোদ্দ মাইল, অথবা সাতকোশ। সেইজন্য ওড়িয়াতে তাকে বলে "সাতকোশিয়া গণ্ড"। চোদ্দমাইল বয়ে গিয়ে সমতলে পড়ে মহানদী চওড়া হয়ে গেছে চৌদুয়ারে এসে। এই সাতকোশিয়া গণ্ডর বুক বেয়ে লক্ষ লক্ষ বাঁশ ভেলা করে ভাসিয়ে দিত ঠিকাদারেরা—চৌদুয়ারে সেই বাঁশের ভেলা খুলে ফেলে কাগজ কলে নেওয়া হত কাগজ তৈরির জন্য। কলকাতার অ্যাণ্ড্রু ইউল কোম্পানির কাগজকল ছিল সেখানে।

গভীর জঙ্গল ছিল সেই গিরিখাতের দু'পারের পাহাড়ে। আর তাতে

ছিল সবরকম প্রাণীর বাস। এক গণ্ডার ছাড়া অন্যান্য অধিকাংশ প্রাণীই পাওয়া যেত সেখানে। হাতি, ভারতীয় গাউর (বাইসন), বাঘ, ভাল্লুক, শুয়োর, শম্বর, কোটরা, হরিণ, মাউস-ডিয়ার, নানা জাতের সাপ, নানা রকম পাখি। তার মধ্যে ধনেশ পাখি ছিল দু'রকম—দ্য গ্রেট ইণ্ডিয়ান হর্ণবিল এবং লেসার ইণ্ডিয়ান হর্ণবিল। টিকরপাড়া পুরানাকোট, বাঘ্মুণ্ডা, টুম্বকা এবং আরও ভেতরে ছিল লবঙ্গী এবং রায়গড়া। নদীর অন্য পাড়ে ছিল দশপাল্লা করদ রাজ্য। টিকরপাড়াতে নদী পেরোতে হত খেয়াঘাটের বড় নৌকোতে। গাড়ি, জিপ, বাস সব সেই খেয়া নৌকোতেই পেরোতো। ওপারের রাস্তা বেয়ে গিয়ে একটি বড় চৌরাস্তা বা চারছক ছিল। সেখান থেকে অন্যান্য করদ রাজ্য বৌধ ও ফুলবানিতে যাওয়া যেত।

ফুলবানিতে উঁচু পাহাড়। ছোটোখাটো হিল স্টেশন বলা চলে।

আমাদের বিশেষ পরিচিত সুরবাবুরা, কলকাতার মৃগাঙ্কমোহন সুরের ভ্রাতারা ওড়িশার কটকে থাকতেন। অংগুলে এবং পুরানাকোটেও তাঁদের ডেরা ছিল। প্রতি বছর অংগুলের বনদপ্তরে জঙ্গল নিলাম হত এবং ঠিকাদারেরা একেকটা জঙ্গল ডেকে নিতেন দরদাম করে। তারপর সেই সব নিভৃত আদিম দুর্গম অরণ্যে তাঁদের নিজেদেরই পথ বানিয়ে নিতে হত জঙ্গলে কাঠ কেটে, সেই কাঠ ট্রাকে করে কটকের কাঠের বাজারে নিয়ে আসার জন্য। বড়ো বড়ো মহীরূহ আর্তনাদ করে করাতের কামড়ে উৎপাটিত হয়ে ধরাশায়ী হত। সে দৃশ্য বড়ো দুঃখবহ ছিল।

আমরা শিকারে যেতাম প্রতিবছর শীতে ওই জঙ্গলে এবং সুরবাবুদের কোন না কোন কাঠ-কাটার ক্যাম্পে থাকতাম।

সুরবাবুদের এক ভাই নরেন্দ্রনাথ সুরেদের জঙ্গলের এক মুহুরী ছিল। তার নাম দুর্গা মাহান্তি। বেঁটেখাটো ছোটোখাটো মানুষটি। গায়ের রং ফর্সা। কথা বলার সময় এবং কথা শোনার সময় একটি চোখ আধ-বন্ধ হয়ে যেত। তার পরনে ধুতি আর নীল হাফশার্ট। পায়ে প্লাস্টিকের জুতো। হাতে একটি পাচনবাড়ির মতো লাঠি। এই সব বিপদসঙ্কুল গহন অরণ্যে মাইলের পর মাইল হেঁটে—সমতলে সাইকেলে এবং বাবুরা যখন আসতেন বাবুদের জিপে চড়ে সে কাজের তদারকি করত। কাঠের বর্গফিটের হিসেব রাখত। কাবাড়িদের, মানে কাঠুরেদের হপ্তা দিত। মানে ওই জঙ্গলে সে-ই একাধারে ম্যানেজার, অ্যাকাউন্টটেন্ট ছিল। কোন ট্রাকে কত কাঠ গেল—কত কাঠ কাটা হল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব সে রাখত।

গাছ কাটার পর অত বড়ো বড়ো গাছের ডালগুলি কাটত কাবাড়িরা। তারপর ট্রাকের দৈর্ঘ্যের মাপে তাদের কাটা হত। সেই সব কাঠ মোষদের দিয়ে টানিয়ে জঙ্গলের পথের পাশে এমন জায়গাতে জড়ো করে রাখা হত—উঁচু জায়গাতে—যেখান থেকে কাঠ ট্রাকে তুলতে সুবিধা হয়। মোষ দিয়ে কাঠ টানিয়ে আনার পদ্ধতিকে ওরা বলত 'ঢোলাই'।

সকালের আলো ফুটতেই কাজ আরম্ভ হত আর সূর্য ডোবার আগে আগে কাজ শেষ করে সকলেই ক্যাম্পে ফিরত। ক্যাম্পের একপাশে কাবাড়িদের জন্যে সার সার ঝুপড়ি থাকত। তারা নিজেরাই রান্না করে খাওয়াদাওয়া করত তারপর জংলি জানোয়ারেরা যাতে না আসে সেজন্য ঝুপড়িগুলোর সামনে আগুন করে সেই আগুনে গা গরম করে মাটির উপরের

শয্যাতে শুয়ে পড়ত। ঝুপড়ির মাথা চুঁইয়ে শিশির পড়ত। ওরা শুয়ে শুয়ে প্রার্থনা করত কখন ভোরের আলো ফুটবে—রোদে তারা গা গরম করতে পারবে। রাতের খাওয়া বলতে অধিকাংশ সময়ই শুধু ভাত। জঙ্গলে তরিতরকারি পাওয়া যেত না। ডালেরও অনেক দাম, তাই ডালও খেতে পারত না তারা। ভাতের মধ্যে আফিঙের গুঁড়ো দিয়ে দিত যাতে ওদের গায়ের ব্যথা মরে, ঘুম ভালো হয়। তাই ওদের অধিকাংশরই হাত-পা সরু সরু ছিল এবং পেটটা বড়, দুচোখের নীচটা ফোলা। তাদের মধ্যে অধিকাংশই চল্লিশ পঞ্চাশ বছরেই মরে যেত। তাদের বারো তেরো বছরের ছেলে বাবার মুখে আগুন দিয়ে শ্রাদ্ধ করে কাঁধে কুড়ুল নিয়ে এসে বাবার কাজে সামিল হত।

এদের তুলনাতে দুর্গা তো বড়লোক ছিল। কাবাড়িদের অধিকাংশরই গায়ে জামা ছিল না। শীতেও না। ধুতি আর একটি গামছা ছিল তাদের সম্বল। এই জীবনেই তারা অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছিল। কোনো অভিযোগ ছিল না কারোর বিরুদ্ধে। কষ্ট বা খিদে অসহ্য হলে তারা ভগবানকে ডাকত। রামায়ণের নানা পালা যেমন সীতাহরণ পালা, কিষ্কিন্ধ্যা পর্ব—এসব দেখত যখন যাত্রার দল আসত জঙ্গলে।

আমরা জঙ্গলে যেতাম অনেক খাদ্য পানীয় নিয়ে। রকমারি গরম জামা, জুতো, মাফলার, বায়নোকুলার, ক্যামেরা, রাইফেল, বন্দুক নিয়ে। ওরা আমাদের দিকে এমনভাবে চাইত যেন অন্য গ্রহের জীব আমরা। আমরা হরিণ শম্বর এমনকী গাউর শিকার করলেও ওরা খুব খুশি হত। মাংস খেতে পারত। জঙ্গলের দূর দূর গ্রাম থেকে পাহাড়-নদী পেরিয়ে তারা হেঁটে আসত দশ পনেরো মাইল একটু মাংসের জন্য। শিকারের মাংসই ওদের কাছে একমাত্র মাংস ছিল—মাটন, চিকেন এসব ওরা জানত না। তাই ওদের ভাষায়, শুধু ওদেরই নয় সারা ভারতবর্ষের বনপাহাড়ের সব মানুষেরই কাছে মাংসের নাম হচ্ছে "শিকার"। ওদের মাংস খাওয়াতে পেরে খুশি হতাম আমরা।

দুর্গার সাহসের কোনও সীমা ছিল না। আমরা যেখানে রাইফেল হাতেও যেতে ভয় পেতাম দুর্গা সেখানে খালি পায়ে, খালি হাতে চলে যেত। একবারের ঘটনা আমার মনে আছে। পুরানাকোট আর টুম্বকার মধ্যে জঙ্গলে আমি একটা বিরাট গাউরকে গুলি করি। সে প্রায় পাহাড়ের মতো দেখতে। তখন অন্ধকার সবে হয়েছে। দুর্গাকে বললাম, টর্চটা নিয়ে চলত দুর্গা,দেখি কী হল। জানোয়ারকে এবং ওরকম বিপজ্জনক জানোয়ারকে আহত করে এ

বনে ছেড়ে দেওয়া যায় না। সে তো বনের মধ্যে গ্রামের মানুষের কাছে বিভীষিকার সৃষ্টি করবে।

দুর্গা বলল, চালন্তু তো আইজ্ঞা।

গভীর বনের মধ্যে সাবধানে এগোলাম আমরা। আমার হাতে রাইফেল আর দুর্গার হাতে টর্চ। একটু গিয়েই দেখা গেল সেই পাহাড়প্রমাণ বাইসন আমাদের দিকে পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। হেভি রাইফেলের গুলি লেগেছে তার বুকে। বুক বেয়ে ঝরনার মতো রক্ত বেরোচ্ছে। হাতির বুকে গুলি লাগলেও এরকম শব্দ করে তোড়ে রক্ত পড়ে।

তার যন্ত্রণা লাঘব করার জন্য এবং আমাদের নিজেদের জান বাঁচানোর জন্যই তার গলাতে অথবা মাথাতে এখুনি একটি গুলি করা দরকার। আমি রাইফেল তুলে দুর্গাকে বললাম ফিসফিস করে, আলো দাও, দুর্গা। গাউরটি আমাদের থেকে হাত পনেরো দূরে দাঁড়িয়েছিল বড়সেগুন আর কণ্টাবাঁশের ঝোপের মধ্যে। তার পুরো শরীর দেখা যাচ্ছিল না। ঠিক সেইসময় দুর্গা আমেরিকান বণ্ড কোম্পানির পাঁচ ব্যাটারির টর্চটাকে বাঁদিকের একটা প্রকাণ্ড সাহাজ গাছে ফেলে আনন্দে নাচতে নাচতে বলল, বাবু। বাবু। সে গাছুটা দেখিলে? বাপ্পালো বাপ্পা সে গুট্টে গাছু হেম্বা!

মানে, বাবু এই গাছটা দেখলে। মানে কত মোটা গাছ এবং কত কাঠ হবে সে গাছে। গাছের মতো গাছ বটে!

এমন সময় পাহাড় যেমন ভূমিকম্পে হঠাৎ করে ভেঙে পড়ে তেমন করে সেই গাউর আমাদের দিকে তেড়ে এল। দুর্গার হাতে-ধরা টর্চের আলো তখনও সেই সাহাজ গাছেই শোভা পাচ্ছিল। অন্ধকারেই আন্দাজে গুলি করলাম আমি। বরাত ভালো যে সেই গাউর প্রচণ্ড আওয়াজ করে প্রায় আমাদের গায়ের উপরেই ধরাশায়ী হল।

আমি রেগে বললাম, এটা তুমি কী করলে?

দুর্গা বলল, মু কম্ব করিবি? দেখিবা যোগ্য গাছু বটে সে গাছুটা!

আর প্রাণটা যদি চলে যেত?

হউ! এত্ব সহজরে প্রাণ জিবে! আপনি আছন্তি না। মুতো জানিচি আপনাকু—গুলি বাজিলা তো প্রাণ গম্বা সে জান্তু গাউর হুউ কি মহাবল।

মানে! হ্যাঁ, অত সহজে প্রাণ যেত। আপনি ছিলেন। আমি তো জানি আপনাকে। গুলি লাগা মানে প্রাণ যাওয়া। সে গাউরই হোক কি বাঘ! (ওরা বাঘকে মহাবল বলে) ❑

প্যাঁকাও

আমার মায়ের মাসতুতো দাদাদের মামাতো ভাইয়ের নাম প্যাথা বোস। প্যাথা বোস-এর আবার সবেধন নীলমণি এক ছেলে। তার নাম ম্যাথা। এক ছেলে বলে বড়মামার ভীষণই আদুরে। প্যাথামামাদের অবস্থাও খুব ভালো। বালিগঞ্জে বিরাট লনওয়ালা বাড়ি। দেখবার মতো বাগান। কত গাছপালা, পাখি, কত রকমের গাড়ি। প্রতি বছর The Statesman কাগজের Vintage Ralley-তে বড়মামা যাত্রাদলের সং-এর মতো মেকআপ নিয়ে এক একবার এক একরকম সেজে মান্ধাতার আমলের বেইন্টলি চালিয়ে র‍্যালি করেন। আমরা আমাদের গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে হাততালি দিই আর পাড়ার ছেলেদের কাছে রেলা নিই। আর এ পাড়ার কোনো ছেলের মায়েরই মাসতুতো দাদার এমন মামাতো ভাই নেই। গর্বে আমার পা পড়ে না সেদিন মাটিতে।

মায়ের সঙ্গে গত সপ্তাহে ম্যাথাদের বাড়িতে গেছিলাম। এ তো আমাদের মতো বাড়ি নয় যে কড়া নাড়লাম বা বেল টিপলাম, অমনি কেউ এসে

দরজা খুলল। বাইরের গেট বন্ধ। অনেক দরোয়ান। তারা জেরাতে জেরাতে জেরবার করে দিল। শেষে ওখান থেকে ফোন করে আমাদের, মানে আমার মা আর আমার চেহারার বর্ণনা আর নামধাম জানাতে ভিতর থেকে বলা হল, আসতে দেওয়া হোক।

প্যাথামামীমা মাকে দেখে মুখ ভেটকে বললেন, কী ব্যাপার! কী মনে করে?

না, কিছু মনে করে নয়। এই মিটকু তোমাদের পাখিগুলো দেখার জন্যে বড় বায়না ধরেছিল।

তারপরই বলল, সেদিন তোমাকে যে কী সুন্দর দেখাচ্ছিল কী বলব!

কোথায়?

অবাক হয়ে বললেন, গয়নায় মোড়া শরীর আর খুব দামী শাড়ি পরা প্যাথামামীমা।

আরে গাড়িতে। স্টেটসম্যান কাগজের র‍্যালিতে। রানি সেজেছিলেন আপনি। রানিদের রানি সাজাটা মানায় না, ঘুঁটেকুড়ুনি সাজলেন না কেন?

তুমি না! ঘুঁটেকুড়ুনিরা কি রূপোর কাজ করা বেইন্টলি চাপে? তা বটে! ভুলেই গেছিলুম।

আমি বললাম, ম্যাথাও কোথায়?

সে তো রাত জেগে ওয়ার্লড কাপ দেখছে। ফুটবল। এখন ঘুমোচ্ছে।

অ।

নতুন কোনো পাখি এসেছে? মামীমা?

কে জানে! ওসব আমি জানি না। তবে দাঁড়াও।

বলেই, বাগান থেকে একজনকে ডাকলেন, ডেকে বললেন, তোমার বাবু কি নতুন কোনো পাখি এনেছেন?

এঁজ্ঞে বৌরানি। এনেছেন বটে এক গাছা নতুন পাখি!

কি পাখি? কোথায়? যাও। একে নিয়ে দেখাওগে যাও।

ম্যাকাও।

ম্যাকাও।

নাম শুনেই আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম।

আমি জানি, দক্ষিণ আমেরিকার পাখি এরা। আরও নানা দেশেও হয়।

লোকটা আমাকে নিয়ে গেল পাখির সামনে।

মস্ত বড়ো ঘর পাখির। ম্যাকাওরই জন্যে আলাদা। আমাদের শোওয়ার

ঘরের মতো প্রায়। তার মধ্যে ইয়া ইয়া ঠোঁট নিয়ে ম্যাকাও বসে আছে। ঘন নীল আর কমলা তার গায়ের রঙ। মোহিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

তারপর ফিসফিস করে বললাম লোকটিকে, ভাই! ছোটো ম্যাকাও কি পাওয়া যায়?

ছোটো ম্যাকাও?

হ্যাঁ। মানে গরিবের বাড়ি রাখা যায়। টিয়ার মতো খাঁচায়।

তা পাওয়া যাবে না কেন! ম্যাকাও অনেক রকমের হয়। তবে এ পাখির দাম কত জানো?

কত?

তিন লাখ টাকা।

একটা পাখির দাম তিন লাখ টাকা? আমার বাবা পঞ্চাশ হাজার টাকার জন্যে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

কিসের জন্যে?

গুমো হাবড়াতে দাদুর দেড় কাঠা জমি ছিল, তাতে মাথা গোঁজার মতো বাড়ি করবেন বলে।

লোকটা হাসল। তারপর দু-হাতের তেলোতে মেরে খৈনী খেল। একটু হেসে বলল, ওই বাড়িটা দেখছ?

কোনটা?

আরে ওই যে। গারাজগুলার পাশে।

হ্যাঁ। ছাই রঙের তো!

হাঁরে বাবা হাঁ।

ওইটা হচ্ছে আমাদের বাথরুম আর পাইখানা। ও করতেই মালিকের আড়াই লাখ খরচ পড়েছে। তোমরা কি খাটা পাইখানাতে থাকবে গুমো হাবড়াতে বাড়ি করে।

আমার খুব রাগ হয়ে গেল। মায়ের কাছে গিয়ে বললাম, চলো।

মামীমাকে দেখলাম না।

মা বললেন, চল রে খোকা, আমরা চলেই যাই। বৌদিদের বাড়ি আজ বিকেলে পার্টি আছে। অনেক লোক যাবে টাবে। সাজানো গোছানো হচ্ছে। এখন আমরা যাই। পরে অফিস ছুটি হয়ে গেলে বাসে অনেক ভিড়ও হয়ে যাবে। বাস থেকে নেমেও তো হাঁটতে হবে অনেকখানি। আজ না রথ! তোর জন্যে তো রথ কিনতে হবে একখানা।

আর পাঁপড়ভাজা, ফুলুরি?

হবে, হবে।

২

ছোটোকাকু অফিস থেকে ফিরলে ম্যাকাও-এর গল্প বললাম চোখ বড়ো বড়ো করে। দাম শুনে ছোটকাকুর গলাতে রুটি আর আলুর তরকারি আটকে গেল। ছোটকাকুর সাইকেলের সঙ্গে একটি ব্যাগ থাকে, আর সাইকেলটা বাইরের ঘরের ভিতরে তুলে রাখা থাকে রোজ। সাইকেলটা ঘরে ঢোকাবার আগে রাস্তার গঙ্গার জলের কলে তার চাকা দুটি ভালো করে ধুয়ে নেয়, যাতে মা বকাবাকি না করে, তাই।

ছোটোকাকু বলল, তোকে তো ম্যাকাও দিতে পারব না। আজ তোর জন্যে একটা প্যাঁকাও এনেছি।

সেটা কি?

ছোটোকাকু ব্যাগ থেকে বের করল, একটা ছোট্ট কাবলি বেড়ালছানা —সাদা, বড়ো বড়ো লোম, দারুণ দেখতে।

আমি বললাম, বাঃ। কিন্তু এতো ঠান্ডা কেন? মরে গেছে নাকি?

মরে যায়নি। গায়ে ময়লা ছিল বলে পথের কলের জলে অচ্ছা করে চান করিয়ে নিয়ে এসেছি।

মা শুনে বললেন, করেছ কি? বেড়াল এমনিতেই জলকে এড়িয়ে চলে। মরে যাবে যে!

ছোটোকাকু বলল, তোমার হাতে আছাড় খেয়ে মরতো ময়লা অবস্থাতে নিয়ে এলে। সাইকেল পরিষ্কার করা সাবানও ছিল সঙ্গে ওকে আচ্ছা করে সাবান দিয়ে চান করিয়ে এনেছি। প্যাঁকাও।

মা বললেন, কী যে করো। দাঁড়াও একটু দুধ গরম করে আনি।

ততক্ষণে আমি প্যাঁকাওকে কোলের মধ্যে নিয়ে খুব আদর করছি। ওর চোখ দুটো গোলাপি গোলাপি। ভাবলাম কে জানে! ছোটোকাকু হয়তো জানে না—আসলে প্যাঁকাও রেওয়ার বাঘের বাচ্চা নয়তো।

ছোটোকাকু বলল, কিরে! তোর ম্যাকাও-এর চেয়ে খারাপ? বৌদির মাসতুতো দাদাদের, বড়োমামাদের বাড়ির ম্যাকাও-এর চেয়ে এই প্যাঁকাও কি খারাপ?

না। খুব পছন্দ আমার।

৩

প্যাঁকাও অনেক বড়ো হয়েছে। আমার বন্ধুদের সঙ্গেও ওর বন্ধুত্ব হয়েছে। আমরা ওকে কালীঘাট পার্কে নিয়ে যাই। একদিন লেকেও নিয়ে গেছিলাম সকালে সাঁতার কাটার সময়ে। জল দেখে ভয় পেয়ে ও দূরে বসেছিল। কুকুরগুলো ভারি পেজোমি করে ওকে দেখলেই।

একদিন আমি প্যাঁকাওকে নিয়ে আমাদের বাড়ির সামনের রকে বসে আছি। এমন সময়ে একটা মস্ত গাড়ি এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে। গাড়িটার সামনেটা রইল ফণেদাদার পানের দোকানের সামনে আর পেছনটা রইল কালোবাবুর মনোহারী দোকানে। গাড়ি থেকে নামলেন প্যাথামামা।

গর্বে আমার বুক ফুলে উঠল। পাড়ার সবাই দেখল যে আমাদের বাড়িতেও এত বড়ো গাড়ি-চড়া মানুষে আসে। পটলা, পেঁচি সব জানালার পর্দার ওপর দিয়ে উঁকিঝুকি মারতে লাগল।

প্যাথামামা বললেন, কী রে ছোঁড়া! তোর ছোটকা আছে? এই তো এল। মা নেই।

চল দেখি। তোর মায়ের সঙ্গে দরকার নেই কোনো।

আমি উত্তেজনায় দৌড়ে গেলাম ভেতরে।

ছোটকা সবে এসে লুঙ্গি গেঞ্জি পরে তক্তপোশে লম্বা দিয়েছিল। আমি ধাক্কা দিয়ে ওঠালাম, বললাম, ছোটকা! ছোটকা!

প্যাথামামাও আমার পেছনে পেছনে ঘরে ঢুকল।

বললেন, তোমার নাম খগেন নয়?

হ্যাঁ।

তুমিই তো এই মিটকুর ছোটকা? আমাদের যোগেনের ভাই। তুমি সেলস ট্যাক্সে কাজ করো না?

হ্যাঁ, স্যার।

ছোটকা তক্তপোশে উঠে বসে বলল।

তোমাকে আমার একটা কাজ করে দিতে হবে। তোমার ওয়ার্ডে আমার সেল ট্যাক্সের ফাইল আছে। আমার একটা সাহায্যের দরকার। ভয় পেও না। তোমার দিকটাও দেখব আমি। চলো একটু আমার সঙ্গে আমার উকিলের কাছে—তিনি সব বুঝিয়ে দেবেন। তোমাদের সঙ্গে আমার 'আত্মীয়তা গড-সেন্ট'। চল।

ছোটকা অফিস থেকে এসে কিছু খায়ওনি। মা পাশের বাড়ির মানী

মামীমার বাড়িতে গেছে। এসে খেতে দেবে। কিন্তু ছোটকা কিছু না বলে, আবার প্যান্ট আর শার্টটা পরে নিল।

হঠাৎ ছোটকা বলল, প্যাঁকাওকে কোথায় ফেলে এলি?

তাই তোৎ উত্তেজনাতে আমি প্যাঁকাওকে রকের উপরেই ছেড়ে চলে এসেছি। তখনও রোদ ছিল। গরমের দিন। ওর গরম লাগাতে কোনো ছায়া খুঁজে সেখানে গিয়ে বসে আছে নিশ্চয়ই।

ছোটকা আর প্যাথামামা গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। উর্দিপরা গুঁফো ড্রাইভার এসে দরজা খুলে ওঁদের বসাল। ছোটকাকে সামনে বসাল তার পাশে। তারপর প্যাথামামা বললেন, চলো, বালিগঞ্জ।

এদিকে আমি প্যাঁকাও। প্যাঁকাও। বলে ডাকতে ডাকতে চারপাশে খুঁজতে লাগলাম। না, প্যাঁকাও কোথাও নেই। ফণেদার দোকানে খাকি হাফ প্যান্ট পরে বসে যে ছেলেটা সুপুরী কাটে, নাটু, তাকেও শুধোলাম, সেও বলল দেখেনি।

মস্ত গাড়িটা স্টার্ট করল। প্রচণ্ড আওয়াজ হয় ইঞ্জিনে এইসব বড়ো গাড়ির। এমন সময়ে গাড়ির নীচে সাদা মতো কী একটি দেখলাম আমি। চিৎকার করে উঠলাম আমি "প্যাঁকাও" বলে, আর ঠিক সেই মুহূর্তে গাড়িটা এক ঝাঁকি দিয়ে এগিয়ে গেল। আমি দেখলাম পেছনের চাটাকা "প্যাঁকাও-এর মাথাটা গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। রক্তে ভেসে গেল পথ।

ছোটকা বলল, পট করে কি একটা আওয়াজ হলো না?

প্যাথামামা বললেন, মাটির ভাঁড়-ফাঁড় কিছু ছিল একটা চাকার নীচে পড়ে ভেঙে গেল।

আমি দৌড়ে গিয়ে প্যাঁকাওকে কোলে তুলে নিলাম। মাথাটা চেপ্টে গেছে—গোলাপি চোখ দুটোও।

আমি দাঁতে দাঁত কিড়মিড় করে বললাম, দেখো প্যাথামামা! বড় হয়ে আমি তোমার ম্যাকাও-এর গলাটা যদি নিজে দুহাতে মুচড়ে না ভাঙি তাহলে আমার নাম মিটকু নয়। তোমার দেনা আমি সুদসুদ্ধ মিটিয়ে দেব। তুমি দেখো। প্যাঁকাও-এর মৃত্যুর বদলা আমি নেবই। তুমি তো তোমার বাবার টাকাতে বড়লোক। আমি নিজে মেহনৎ করে বড়লোক হব। দেখো তুমি। কিন্তু বড়লোক হলেও আমি অসভ্য হব না। মানুষকে মানুষ জ্ঞান করব। দেখো। ❑

অখ্যাত শিকারি

যার কাহিনি বলছি, তার নামে কোনোদিন ইতিহাসের পাতা উজ্জ্বল হবে না। এই নামটি লোকে চিরদিন মনেও রাখবে না। তবু তোমাদের কাছে তার গল্প করছি এই জন্যে যাতে আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা অন্ততঃ তাকে মনে রাখবে।

লোকটি একজন শিকারি। সে যে অঞ্চলে শিকার করে সেটা আসামের গোয়ালপাড়া জেলা। তার বাইরে সে শিকার করে না তা নয়, কিন্তু গোয়ালপাড়া জেলাতেই তার আধিপত্য বেশি।

নাম তার সাত্তার। ওর বাবা মারা গেছেন বাঘের হাতে, এর মধ্যে ওরও ঘোরা হয়ে গেছে হাসপাতাল বার কতক বাঘের থাবা খেয়ে। ক্ষেতে গরুকে

বাঘে ধরেছিল বলে ওর বাবা একদিন গিয়েছিলেন গরুকে উদ্ধার করতে। সোজা গিয়ে গরুর ঘাড়ে বসে থাকা বাঘকে গুলি করলেন। গুলি লাগলো গায়ে কিন্তু তীরের মতো ঝাঁপিয়েও পড়লো বাঘ সাত্তারের বাবার উপর, তারপর দুজনেই মাটিতে পড়ে গেলেন। সাত্তার তখন খুব ছোট, ভাল করে জানেও না বন্দুক চালাতে। সে চিৎকার শুনে দৌড়ে এসে বাবার অবস্থা দেখে পাগলের মতো বাবার হাত থেকে ছিট্‌কে পড়া বন্দুকটাকে নিয়ে বাঘের বুকে ঠেকিয়ে দিল ঘোড়া টিপে। বাঘ মরলো কিন্তু ওর বাবা বাঁচলেন না। সাত্তার বলে, ওর সান্ত্বনা, তাও তো মেরেছে পিতৃহন্তাকে নিজ হাতে।

একটি রাতের গল্পই বলি আজ। সাত্তারের সঙ্গে চলেছি পায়ে হেঁটে কচুগাঁওয়ের জঙ্গলের কাছে। বন্দুকে টর্চ লাগানো রয়েছে। হঠাৎ ডানদিকে ছোটো ছোটো ঝোপের পাশে চারটে সবুজ চোখ জ্বলে উঠলো। অমাবস্যার রাত কালির মতো অন্ধকার চারদিকে, চাইলে চোখ ব্যথা করে, রাতও প্রায় দুটো। সাত্তার বলল হরিণ। কিন্তু জন্তু দেখা যাচ্ছিলো না—শুধু চারটে চোখ কখনো সবুজ, কখনো নীল জ্বল্ জ্বল্ করছে, সে চোখের দিকে চাইলে গা ছম্ ছম্ করে। সাত্তার ফিস্ ফিস্ করে বলল—চলুন, মারা যাক। এগোলাম সন্তর্পণে। যখন বেশ কাছাকাছি এসেছি, আবার আলো জ্বালতেই ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। দেখি এক জোড়া বিরাট চিতাবাঘ, চুপ করে দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে, লেজ দুটো শুধু এদিক-ওদিক করছে। সাত্তারকে ইশারা করলাম। বলল—ঠিক আছে, এগিয়ে চলুন, ঠিক মারা যাবে।

বলেই সে এগিয়ে যেতে লাগল, বাধ্য হয়ে আমাকেও যেতে হল ওর সঙ্গে। তখন আমরা বাঘের থেকে বড় জোর হাত পঁচিশেক দূরে, ওদিকে বাঘ আর বাঘিনী দুজনই কিন্তু গর গর করে আওয়াজ করতে আরম্ভ করেছে। সে-আওয়াজে যেন অত্যন্ত বিরক্তি মাখানো। ততক্ষণে আমরা আরো এগিয়ে গেছি, কাঁধে লাগিয়েছি বন্দুক যাতে যখনই দরকার হয় তখনই ছুড়তে পারি। সাত্তার যে এখনো কেন গুলি ছুঁড়ছে না আর আমাকেও মারতে বলছে না, বুঝতে পারছি না।

এদিকে বাঘেরা গর গর করেই চলেছে, লেজ আছড়িয়েই চলেছে। যে কোনো মুহূর্তে লাফিয়ে পড়তে পারে। আর লাফালে এই অমাবশ্যার অন্ধকারে কেবলমাত্র টর্চ সম্বল করে গুলি করলে গুলি লাগবে কিনা ভগবান জানেন। উত্তেজনায় ঘামতে থাকলাম আমি। আমরা তখন বাঘের প্রায় পনেরো হাতের মধ্যে এসে পড়েছি, এখন গুলি না করে ফেরার উপায়ও নেই। হঠাৎ, আমাদের

সম্পূর্ণ চমকে দিয়ে বাঘিনীটা পিছনের জঙ্গলে ঢুকে গেলো, এবং তার একটু পরেই বাঘটাও। যে ঝোপে তারা ঢুকলো ঠিক তার পিছনেই একটা নালা ছিল, কোমর সমান জল প্রায় তাতে। বাঘ দুটো অদৃশ্য হতেই সাত্তার বলল টর্চ নিবিয়ে দিতে। নিবিয়ে দিলাম, নিবিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আকাশে তখন মিট মিট তারার আলো।

এবার সাত্তার বলল, বসে পড়ুন মাটিতে। ওর সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে বসে পড়লাম। মাটি থেকে সোঁদা সোঁদা গন্ধ বেরুচ্ছে, পিটাস ঝোপের থোকা থোকা ফুল থেকে বিশ্রী একটা বুনো বুনো গন্ধ আসছে। আমরা নিঃশব্দে বসে আছি সেই ঝোপটার দিকে চেয়ে, যে ঝোপটাতে বাঘ দুটো অদৃশ্য হয়েছে হঠাৎ।

অনেকক্ষণ কেটে গেছে। এক মিনিট, দু-মিনিট, কত মিনিট কে জানে। ঝিঁঝিরা ডাকছে চিপ্ চিপ্। ফিস্ ফিস্ করে সাত্তার বললো, বাঘ দুটো এক্ষুণি বেরুবে ঐ শিশু গাছটার পাশ দিয়ে। খুব সাবধান, প্রথমে যেটা বেরুবে সেটাকে আমি ঐখানেই মারবো, তারপর যেটা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আক্রমণ করবে, সেটাকে আপনার মারা চাই কিন্তু। উত্তেজনায়, ভয়ে আমার হাত ঘেমে গেছিল,তবুও সাহস দেখিয়ে বললাম, ঠিক আছে। কিন্তু আমার কথা বলার আগেই বোধহয় হুড়মুড় করে ঝোপ ভেঙে বেরিয়ে এলো বাঘটা সোজা আমাদের দিকে। বিদ্যুতের মতো বেরিয়েই লাফ মারতে যাবে, কিন্তু লাফাবার আগেই সাত্তারের বন্দুক গর্জে উঠল। তীব্র আক্রোশে কাতরোক্তি করে বাঘটার সবল দেহ প্রায় গড়িয়ে এসেই থেমে গেল আমাদের কিছু সামনে, আর সঙ্গে সঙ্গে বিকট গর্জন করে আকাশ-বাতাস, বন-জঙ্গল কাঁপিয়ে লাফাল বাঘিনী আমাদের উপর। এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ে এত কাণ্ড ঘটে গেল। কি করে যে অতো তাড়াতাড়ি বিপদ এসে পড়ল, ভালো করে বোঝবার আগেই অস্পষ্ট আলোতে দেখতে পেলাম নখে দাঁতে চোখে মৃত্যুর ক্ষুধা নিয়ে লাফিয়ে পড়েছে, একটা আবছায়া প্রেত।

সঙ্গে সঙ্গে নিজের অজ্ঞাতেই বন্দুক তুলে গুলি করলাম আর গুলি করার সঙ্গে সঙ্গেই সরে যেতে চেষ্টা করলাম একপাশে লাফিয়ে। কিন্তু সরতেও পারলাম না, তাড়াতাড়িতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম একটা জংলী কুলঝোপের উপর মুখ থুবড়ে। তার পরক্ষণে কি ঘটে গেল মনে নেই, দিব্য চক্ষে ভেসে উঠল আমার ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত দেহ। কিন্তু আমার ভাবনারও আগে বোধহয় সাত্তারের বন্দুক আবার গর্জন করে উঠল, আর শুনতে পেলাম আমার কাছেই কুলঝোপের ঠিক পাশেই সেই বাঘিনীর আছড়ে পড়ার শব্দ। মনে হচ্ছিলো যেন অজ্ঞানই হয়ে গেছি। সাত্তার সেদিন না থাকলে তোমাদের এই গল্প আর বলতে পারতাম না কোনোদিন। আমার গুলিটাও লেগেছিল, কিন্তু বাঘটা তখন প্রায় আমার মাথার উপরেই চলে এসেছিল। সেই বিপদের সময় একটুও বুদ্ধি না হারিয়ে বিদ্যুৎগতিতে সাত্তার যদি না বাঘের বুক লক্ষ্য করে নির্ভুল গুলি করত তবে মৃত্যুই আমার সাথী হতো।

যাই হোক, সে যাত্রা পুনর্জ্জীবন লাভ করে যখন ভাল করে চাইলাম মাটির দিকে—ভারী আনন্দ হল, বাঘ আর বাঘিনীকে দেখে। মৃত্যুর দোসরেরা মৃত্যুর কোলে। চোখেমুখে তখনও হিংসার ভাব ফুটে রয়েছে তাদের।

ধন্য সাত্তারের সাহস, ধন্য তার নিশানা। ❑

ম্যাথস

বাঁদরের তৈলাক্ত বাঁশে চড়ার অঙ্কই হোক, কি চৌবাচ্চার জল ফুরানোর হিসেবের অঙ্কই হোক, কোনও অঙ্কই আমার ঠিক হত না। এমনকি, সামান্য যোগ বিয়োগ-গুণ-ভাগেও ভুল হত।

অক্ষয়-স্যার আমাদের স্কুলের মাস্টারমশাই তো ছিলেনই, ম্যাথস-এ কাঁচা বলে বাবা ওঁকে বাড়িতেও পড়াতে বলেছিলেন আমাকে। টকটকে ফর্সা রং ছিল ওঁর। খোঁচা-খোঁচা কালো গোঁফ। ধুতি আর পাঞ্জাবি পরতেন। গায়ে একটি এন্ডির চাদর থাকত। পায়ে পাম্প শু।

টেবিলের উলটো দিকের চেয়ারে বসে আমার খাতার উপর ঝুঁকে পড়ে

অঙ্কের ফল দেখতে দেখতে ওঁর মুখ বিরক্তিতে ভরে উঠত। ভুরু কুঁচকে যেত। বলতেন, 'ই-ইটা কী?'

কখনও বা গম্ভীর গলায় বলতেন, যেন টেবিল-চেয়ারকেই বলছেন, 'আর কতবার বলতে হবে তোমাকে যে, সংখ্যাকে না বদলে তা কেটে পাশে পরিষ্কার করে লিখবে?'

আমি মুখ নীচু করে থাকতাম। ভীষণ কষ্ট হত বুকের মধ্যে!

অক্ষয়-স্যার যখন আমাকে বকতেন, মারতেনও কখনও, তখন আমার অত কষ্ট হত না। কিন্তু ওঁর মুখে যখনই বিচ্ছিরি বিরক্তির ভালো ফুটে উঠত, সেই মুখে আমি স্পষ্টই পড়তে পারতাম, আমি একটি গাধা। এবং উনি আমাকে নিয়ে রীতিমতই নাজেহাল। অথচ ট্যুইশানিরও দরকার নিশ্চয়ই ছিল তখন ওঁর। তাই বলতেও পারতেন না বাবাকে যে, আমাকে আর পড়াবেন না।

ওঁর একমাত্র ছেলে গোপেনদা ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিলেন। ওঁর জন্যে অক্ষয়-স্যারের গর্বের অন্ত ছিল না।

উনি চলে গেলে অনেকক্ষণ একা ঘরে আমি বসে থাকতাম। নিজের উপর বড়ই রাগ হত। অথচ কী করব? অঙ্ক আমার একেবারেই ভালো লাগত না। কবিতা লিখতে, ছবি আঁকতে, গান গাইতে ভালো লাগতো। কিন্তু ওইসব তো গুণের মধ্যে পড়ত না। যে-গুণ ভাঙিয়ে টাকা রোজগার না-করা যায়, তা কি আর গুণের মধ্যে পড়ে?

বাবা অফিস থেকে ফিরলেই শব্দ পেতাম। গ্যারাজ ছিল একতলাতেই, আমার পড়ার ঘরের পাশেই। অফিস থেকে ফিরেই বাবা একবার আমার ঘরে ঢুকতেনই। বলতেন, খোকন, কেমন হচ্ছে পড়াশোনা? পরীক্ষা তো এসে গেল। কোনওদিন বলতেন, আমি তো জানিই, তুই স্কলারশিপ পাবিই। তবে স্ট্যাণ্ড করলে আরও খুশি হব।

বাবাকে আমি ভালোবাসতাম খুবই। কিন্তু আমার সম্বন্ধে বাবার এমন উঁচু ধারণায় কুঁকড়ে যেতাম। আপত্তিও করতে পারতাম না। বলতে পারতাম না যে, আমি হয়তো ফার্স্ট ডিভিশনই পাব না।

নিজের ছুঁড়ে দেওয়া কথাতে নিজেই খুশি হয়ে, দোতলায় উঠে যেতেন বাবা আমাদের ফক্সটেরিয়ার কুকুর 'ম্যাডা'কে আদর করতে করতে। বাবার গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ পর্যন্ত চিনত ম্যাডা। গাড়ি যখন রাস্তায় এবং আর কেউই যখন বুঝতে পর্যন্ত পারত না, ম্যাডা তখন উত্তেজিত গলায় ডাকতে-

ডাকতে দোতলা থেকে তার পায়ের নখে খচর-খচর আওয়াজ করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে তড়িৎগতিতে নেমে এসে গ্যারেজের সামনে ছুটোছুটি করত।

বিহারের মধুবনী জেলার এক রং-রুট ড্রাইভার সুরজনারায়ণ ঝা, অতি উত্তেজিত ম্যাডার একটা পায়ের উপর চাকা তুলে দিয়ে সামনের বাঁ পাটাকে একবার প্রায় ভেঙেই দিয়েছিল একদিন।

বাবা উপরে চলে যাওয়ার পর আরও খারাপ লাগত। অক্ষয়-স্যার পড়ালে গোরু গাধাও নাকি ফার্স্ট ডিভিশন পায়। আমি অন্য সব বিষয়ে খুব ভালো না হলেও, অঙ্কের মতো অতটা খারাপ ছিলাম না। তাই অঙ্কের দায়িত্ব অক্ষয়-স্যারের হাতে তুলে দিয়ে বাবা নিশ্চিত হয়ে যা খুশি তাই ভাবছিলেন।

বন্ধুদের কাছেও শুনতাম যে, তাদের সকলের বাবাও নাকি ওইরকমই বলতেন। প্রত্যেকের মায়েরাই বলতেন, 'তোর বাবা কোনওদিন ক্লাসে সেকেণ্ড হয়নি। আর তুই?'

আমার বন্ধু প্রণব একদিন দুঃখ করে বলেছিল, ভেবে দ্যাখ সক্কলের বাবাই যদি ক্লাসে ফার্স্ট হতেন, তা হলে ওঁদের সময়ে ক্লাসে সেকেণ্ড হতেন কে বল তো?

প্রীতি বলেছিল, আর ফেলই বা করতেন কারা? আমি তো ভেবেই পাই না।

২

অক্ষয়-স্যার সপ্তাহে তিনদিন আসতেন। তাঁর বিরক্তি আর আমার হতাশা ও অপরাধবোধ ক্রমশ বেড়েই চলেছিল।

একদিন এক টিপ নস্যি নিয়েই উনি আমাকে বললেন, খারাপ ভালোর অনেকরকম হয় বুঝেছ? তোমার মতো ছেলে আমি আর দেখিনি। তোমার বাবা মিছেই তোমার পেছনে পয়সা খরচ করছেন। আমি এবার তোমার বাবাকে বলব। তোমার মতো দু-চারটি ছাত্র পেলেই আমার এতদিনের সুনাম ডুববে। এত সোজা অঙ্ক, তাও তুমি....

আমি মাথা নীচু করেই ছিলাম। অনেক ছেলে, বাবা-মায়ের কাছে রিপোর্ট লুকোয়, পাছে তাঁরা মারেন, বকেন। আমি কখনই লুকোইনি। অক্ষয়-স্যার আমার কথা বাবাকে বলে দিলেও বাবা আমাকে কিছু বলতেন না, কিন্তু বড় দুঃখ পেতেন নিশ্চয়ই। বাবাকে ভালোবাসতাম বলে বাবা দুঃখ পান, তাও চাইতাম না। অথচ আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেও তৈলাক্ত বাঁশে বাঁদরের ওঠার

অঙ্ক বা চৌবাচ্চার জল ফুরানোর অঙ্ক কিছুতেই করতে পারতাম না। সেই সময় কোনও রবীন্দ্রসঙ্গীতের কলি কানের পাশে ঘুরঘুর করত। চোখের সামনে বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক'-এর রাজা দোবরুপান্না বা মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'র হোসেন মিঞার মুখ ভেসে উঠত। আলজেব্রাও একদম ভালো লাগত না। জিওমেট্রি একটু ভালো লাগত। মনে হত ছবি আঁকছি। কিন্তু থিওরি এলেই মাথা একেবারে গোলমাল হয়ে যেত। আমি পরীক্ষায় ভালো ফল না করলে যে বাবা দুঃখ পাবেন—এই কথাটা ভেবেই আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসত। বাবার দুঃখ পাবার ভয়ে নিজে আগেভাগে এত দুঃখ পেতাম যে, তা বলবার নয়। বাবার মস্ত কারখানার ভার তাঁর একমাত্র ছেলে নেবে এই-ই ছিল বাবার ইচ্ছে।

ভালো ছাত্র ছিলাম না বলেই স্কুলের কোনও মাস্টারমশাই ভালো চোখে দেখতেন না আমাকে। যদিও ব্যবহার এবং স্বভাব পড়াশুনোর তুলনায় একটু ভালো ছিল বলে কেউ খারাপ বলতেন এমনও নয়। আমি জানতাম যে, শিশির অথবা অনিমেষ, সকলেই ছাত্র হিসেবে আমার চেয়ে অনেকই ভালো ছিল। কাটু, বাণ্টা, এরা সব পড়াশুনাতে শিশিরদের মতো ভালো না হলেও খেলাধুলার জন্যে আলাদা এক ধরনের সম্মান পেত স্যারদের কাছ থেকে। পুরো স্কুলে ছেলেরাও তাদের হিরো-জ্ঞানে দেখত। কাটুর তো তখন এতই কদর ফুটবলে যে, চার ফুট দশ ইঞ্চি হাইটের ম্যাচ হলেই এক বিকেলে চার-পাঁচ জায়গায় ওকে ভাড়া করে নিয়ে যেত বিভিন্ন ক্লাব। ওর নিন্দুকেরা বলত, ও নাকি এক কাপ চা ও বিস্কুট পেলেই ভাড়ায় খেলে দেয়। কাটু বিকেলের প্রথম খেলাতে নেমেই গোটা ছয়েক গোল দিয়ে তাদের এগিয়ে রেখে অন্য ম্যাচে গিয়ে পটাপট গোল দিয়ে আবার প্রথম ম্যাচের জায়গায় গিয়ে দেখত, প্রতিপক্ষের স্ট্রাইকাররা গোল শোধ করে দিয়েছে কি না। যদি ছ'টার বেশি গোল তারাও দিত, তবে কাটু তক্ষুনি গোটা দুই তিন গোল দিয়ে সেই ম্যাচের ইতি টানত।

প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের দিন শিশির এত বই পেত প্রাইজ হিসেবে, যে, একা বয়েই নিয়ে যেতে পারত না। তিন-চারজনের সাহায্য লাগত। স্পোর্টস এর প্রাইজের দিনও অন্যান্য ছেলেরা কত মেডেল, কাপ সব পেত।

জীবনে কী পড়াশুনোতে, কী স্পোর্টসে, কোনওদিন একটিও প্রাইজ পাইনি। রেজাল্ট বেরোবার দিন, প্রাইজের দিন, বড় মনমরা হয়ে বাড়ি ফিরতাম। এই ভেবে সান্ত্বনা দিতাম নিজেকে যে, আমরাই তো দলে ভারী।

যারা প্রাইজ পেল, তারা ক'জন? তবুও বড় ছোট, সাধারণ, ভিড়ের মধ্যের একজন বলে মনে হত নিজেকে। কোনও কোনওবার প্রাইজ ডিসট্রিবিউশনের অনুষ্ঠানে গান গাইতে বলা হত আমাকে। সে-গান আমার মা'ই শিখিয়ে দিতেন। গানও কিছু আহামরি গাইতাম না। অমন গান সকলেই গাইতে পারত।

কেবলই ভাবতাম, আমি খারাপ। আমি কোন কিছুতেই ভালো নই। ফার্স্ট বয়দের মতো লাস্ট বয়দেরও একটা আলাদা পরিচয় থাকে, বৈশিষ্ট্য থাকে। আমার তাও ছিল না। যে বয়সে প্রত্যেকেই ইমপর্ট্যান্ট হতে চায়, সেই বয়সে তখন আন-ইমপর্ট্যান্ট হয়ে থেকে মরমে মরে যেতাম।

আমাদের ক্লাসের লাস্ট বয় গজু। বয়সে সে আমার চেয়ে অন্তত চার-পাঁচ বছরের বড় ছিল। একই ক্লাসে ছিল পাঁচ বছর। গতবার ফাইনাল পরীক্ষায় বাংলা পরীক্ষার দিনে আমার পাশেই সিট পড়েছিল গজুর। ও ঘাড় নীচু করে আমার কানে মুখ ঠেকিয়ে গরম নিশ্বাস ফেলে বলেছিল, বিপ্রকর্ষ কী রে?

গার্ড ছিলেন নরু-স্যার। দুষ্টু ছেলেরা তাঁকে ডাকত 'ঘাড়-ছোট নরু-স্যার' বলে। গজুর কথাতেই আমার দিকে তাকিয়েছিলেন উনি। ওঁর অভ্যাস ছিল ক্লাসের এ-প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি পায়চারি করে বেড়ানো। ক্লাসে পড়াবার সময়ও অমনই করতেন। গার্ড দেবার সময়ও তাই করেছিলেন। উনি যেই দূরে চলে গেলেন, গজু ফিসফিস করে বলল, তোর পেট যদি আজ ছুরি দিয়ে না ফাঁসাই, তো আমার নাম গজশোভা রায় নয়।

সেকথা শুনেই আমার পিলে চমকে গেল। গলা শুকিয়ে এল। কানাঘুষোয় আমি শুনেছিলাম যে, গিরিশ পার্কের পাশে ও একটি মরচে-পড়া ছুরি দিয়ে একটি ছেলেকে খুন করেছিল। মরচে-পড়া ছিল বলে ছেলেটাকে বাঁচাতে পারেনি ওর মা-বাবা অনেক চেষ্টা করেও। কিন্তু গজুর বাবা ছিলেন পুলিশের দারোগা। তাই কিছুই হয়নি ওর।

ঘাড়-ছোট নরু-স্যার কথাটা শুনে ফেললেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, গজু, কেন ছেলেমানুষকে ভয় দেখাচ্ছ? বিপ্রকর্ষর মানে জানতে চাও তো আমিই বলে দিচ্ছি। কিন্তু এই একটি প্রশ্নের উত্তর ঠিক লিখলেই কি তুমি পাশ করে যাবে এবারে?

গজু নরু-স্যারকে ধমকে বলল, স্যার আমি অলরেডি চটে আছি। আমাকে আর চটালে কার পেট যে ফাঁসবে তার ঠিক নেই।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। একটু নস্যি নেবে? বলেই ঘাড় ছোট নরু-স্যার গজুর কাছে গিয়ে ওকে নস্যি অফার করলেন। গজু রেগুলার নস্যি নিত। স্যারের ডিবে থেকে একটিপ নস্যি নিয়ে কিছুটা আমার নাকে উড়িয়ে একটি নোংরা রুমাল বার করে নাক ঝাড়ল।

সেই মুহূর্তে ভালো ছাত্র শিশির সম্পর্কে যেরকম সম্ভ্রম ছিল আমার মনে, খুনি এবং ওঁচা ছাত্র গজু সম্পর্কেও, তার দুর্দান্ত প্রতাপ দেখে, ঠিক সেরকম নয়, তবে অন্য একরকম সম্ভ্রম জাগল। সেই মুহূর্তে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, জীবনে বিশেষ কেউ হতে হলে খুবই ভালো হতে হবে। এখানে মাঝামাঝিদের কোনও পরিচয় নেই, দামও নেই। খুব ভালো যদি না হওয়া যায়, তা হলে খুব খারাপ, গজুর মতো হওয়াও বোধহয় ভালো। কিছু না হয়ে থাকার চেয়ে তবু কিছু একটা হওয়া হল। আমাদের বন্ধু রাজেন যেমন 'কিছু' হল সেদিন রাস্টিকেটেড হয়ে। বাবার আলমারি ভেঙে টাকা নিয়ে সে বোম্বে যেতে চেয়েছিল সিনেমায় নামবে বলে। খড়্গপুরেই পুলিশ পাকড়াও করে নিয়ে আসে তাকে। বোম্বেও যাওয়া হল না, রাস্টিকেটেডও হল।

৩

যেদিন স্কুল ফাইনালের রেজাল্ট বেরোল, সেদিন বাথরুমে গিয়ে খুব কাঁদলাম। আমার চেয়ে বেশি কাঁদলেন মা। এবং মা'কে অপদার্থ ছেলের জন্য কাঁদতে দেখে আমার বুক ফেটে যেতে লাগল।

সন্ধের পর অক্ষয়-স্যার এলেন। আমি পড়ার ঘরেই ছিলাম। ট্যাবুলেটরের কাছ থেকে উনি মার্কস জেনে এসেছিলেন। যেহেতু অঙ্কই পড়াতেন, অঙ্কের মার্কসই শুধু জেনেছিলেন। ওঁর মুখে আমার প্রতি সেই ঘৃণা, বিতৃষ্ণা আর অধৈর্য চিরদিনই ছিল। সেইসব আবারও তীব্র ঝলকে ফুটে উঠল। পথের ডাস্টবিনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় অনেকে যেমন নাকে রুমাল চাপা দেন, তেমন করে আমার খারাপত্বর গন্ধও যেন ওঁর নাকে লেগে ওঁকে ভীষণ পীড়িত করছিল। নস্যি-মাখা রুমাল দিয়ে নাক চাপা দিলেন উনি।

মুখটি নীচু করেই রইলাম আমি। এ-মুখ কাউকেই দেখানোর নয়।

অক্ষয় স্যার বললেন, তুমি আমার লজ্জা। তোমার মতো গোটা-দুই ছেলে যদি আমার লিস্টে থাকে, তবে আমার প্রাইভেট টিউটর হিসেবে যে সুনাম, তা একেবারেই উবে যাবে। তোমার বাবাকে বোলো, অন্য টিউটরের খোঁজ করতে। তুমি পঁয়তাল্লিশ পেয়েছ। বুঝেছ? ইয়ে! পঁয়তাল্লিশ! আর

বোলো, তোমার ব্রিলিয়ান্ট মার্কসের কথা। ছিঃ ছিঃ! কী বাবার কী ছেলে! লজ্জা, লজ্জা! তুমি আমার ছেলে হলে....।

হলে যে কী করতেন, সেটা না বলেই এগোলেন। গোপেনদা যে আমার চেয়ে কত ভালো তা আমি জানতামই। ও-কথা ওঁর বলার দরকার ছিল না। চলে যেতে গিয়েই ফিরে দাঁড়িয়ে আবার বললেন, তোমার বাবা আমাকে যদি কিছু বলেন, তা হলে আমি কিন্তু ওঁকে ভালো করেই শুনিয়ে দেব, গাধা পিটিয়ে ঘোড়া নিশ্চয়ই করা যায়, কিন্তু তু-তু-তুমি তো....।

চলে গেলেন উনি।

টেবিল লাইটটা জ্বলছিল। আমি টেবিলের উপরেই দু-হাতের মধ্যে মাথা পেতে শুয়েছিলাম। একটু পরই হঠাৎ ম্যাডার ঘনঘন চিৎকারে চমকে উঠলাম। শুনতে পেলাম বাবার গাড়িটা গ্যারেজে ঢুকল। ড্রাইভার বাহাদুর জিজ্ঞেস করল বাবাকে, কাল সকালে কখন আসবে? তারপর চাবি দিয়ে, 'সেলাম সাহাব', বলে চলে গেল।

ম্যাডা লাফাতে-লাফাতে বাবার পায়ে-পায়ে আমার ঘরে এসে ঢুকল। আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। বাবা আমার মুখের দিকে চেয়েই বুঝলেন। বললেন, কী খোকন? মনটা খারাপ মনে হচ্ছে। হলটা কী?

আজ যে স্কুলে ফাইনালের রেজাল্ট বেরোবে তা বাবা জানতেন। কিন্তু আমি যে স্কলারশিপ পাবই তা যেন উনি ধরেই নিয়েছিলেন। সামান্য অবাক হয়ে বললেন, "কী? ভালো হয়েছে ফল?"

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কোনও রকমে আমি বললাম, সেকেণ্ড ডিভিশান।

বলতে চাইলাম, কিন্তু বলতে পারলাম না যে অঙ্ক আমার কোনওদিন ভালো লাগেনি বাবা। তুমি মিছিমিছি পয়সা নষ্ট করলে অক্ষয়-স্যারকে রেখে।

ও! বাবা বললেন।

তারপর এক মুহূর্ত চুপ করে থেকেই বলেন, "ম্যাথস কীরকম হল?"

ম্যাথস-এ পঁয়তাল্লিশ। আর অ্যাডিশন্যাল ম্যাথস-এ পঁচিশ। বলেই আমি

নে জগু, তুহ একশো ঢাকা রাখ আজ খ্যাশর াদন।

বলেই বললেন, চল খোকন। জগু তুই ম্যাডাকে ধর। নইলে ঝামেলা করবে।

বাবা নিজেই গাড়ি বের করলেন গ্যারাজ থেকে। সামনের বাঁদিকের দরজা খুলে দিলেন। ওই সিটে মা বসেন। আমি বসে পড়েই দরজা বন্ধ করে দিলাম।

জগুদা গেট খুলে দিল। বাবা গাড়ি চালিয়ে চললেন, নিউ মার্কেটের দিকে। বললেন, "এই রে! চিংড়ি মাছ তো তোর মা ভালোবাসেন। তুই তো ভালোবাসিস ভেটকি মাছের ফ্রাই। চল, দেখি। পেয়ে যাব ঠিকই। এখন ফ্রাই পিস করে কাটার লোক পাব কিনা সেই হচ্ছে কথা!"

আমি চুপ করেছিলাম। আমার ভীষণ জোরে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু চলন্ত গাড়ির মধ্যে কাঁদলে লোকে কী ভাববে?

পার্ক স্ট্রিটে পড়েই বাবা বললেন, তোর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত আমার। উচিত কেন, চাইছিই ক্ষমা। বুঝলি খোকন!

কী বলছ বাবা? আমি হতভম্ব হয়ে বললাম।

হ্যাঁ, তোর ইনক্লিনেশান ছিল আসলে আর্টসেরই দিকে। প্রথম থেকেই লিটারেচারে তুই তো ভালোই। আসলে লিটারেচার হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষিত মানুষের সাবজেক্ট। আমরা তো হলাম গিয়ে মিস্তিরি। সে এঞ্জিনিয়ারই বল, আর অ্যাকাউন্ট্যান্টই বল। জজ বল, ব্যারিস্টার বল, ডাক্তার বল—যিনি সাহিত্য না পড়েছেন বা পড়েন, বা সাহিত্যের খোঁজ না রাখেন, তিনি আসলেই অশিক্ষিত। সাহিত্যই হচ্ছে শিক্ষিত মানুষের মনের সবচেয়ে বড় এক্সপ্রেশান।

একটু থেমে বললেন, এত বড় ফ্যাক্টরিটা করেছিলাম। তুই ছাড়া আমার তো কেউই নেই। একমাত্র সম্বল তুইই। আজকাল কত সব কথা শুনছি। বিদেশে গিয়ে কমপিউটার ব্যবহার হচ্ছে সব ব্যাপারেই। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি প্রতিদিন কোথায় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মানুষকে, মানে, মেটিরিয়াল ওয়ার্ল্ডে।

ভেবেছিলাম, সায়েন্স নিয়ে পড়লে তোর পক্ষে....। যাক গে, মাই লাইফ ইজ মাই লাইফ, অ্যাণ্ড ইওর লাইফ ইজ ইওরস। তুই যা হতে চাস খোকন, তাই-ই হয়ে ওঠ জীবনে। আমি তোকে আর ভুল পথে চালাব না। আই অ্যাম সরি। রিয়েলি আই অ্যাম।

নিউ মার্কেটের সামনেটা তখন ফাঁকা। আলো প্রায় সব নিবে গেছে। ফুলের দোকানগুলো খোলা আছে শুধু। তাও বাইরে ঝাঁপ নামানো। গ্লোব সিনেমার সামনে একটা বিরাট হোডিং। সিনেমার বিজ্ঞাপন। ছবির নাম 'আই উইল ক্রাই টুমরো।'

বাবা একটু পরেই মুটের মাথায় বাজার নিয়ে ফিরে এলেন। আমি তাড়াতাড়ি নেমে বাবার হাত থেকে চাবি নিয়ে গাড়ির বুটটা খুললাম। মাল সব রেখে বাবা মুটেকে পাঁচ টাকা দিলেন। মানুষটি বলল, ফুটা নেহি সাহাব।

বাবা বললেন, আমার ছেলে আজ পরীক্ষায় পাশ করেছে। কলেজে যাবে। তোমাকে বকশিশ দিলাম।

মানুষটি একটু অবাক হয়ে মাথায় হাত ঠেকাল।

গাড়িটা ময়দানের দিকে নিয়ে চললেন বাবা। ময়দানে পৌঁছে বললেন, পোলাও হতে হতে আমরা পৌঁছে যাব কী বল? তোর মা আছেন, নগেন আছে, জগু আছে, রাঁধতে কত সময় লাগবে? চল, একটু পায়চারি করি।

বাবা গাড়িটার পাশেই সামনে-পিছনে হাঁটবেন বলে মনে হল। একটু হেঁটে বললেন, নাঃ চল তোর মা ভাববেন। যেতে যেতেই তোকে গল্প বলব। একটু চুপ করে থেকে বললেন, তুই মেণ্ডহেলসনের নাম শুনেছিস?

না তো!

সে কী রে? একটি বই আছে ওঁর জীবনী নিয়ে লেখা, নাম 'বিয়ণ্ড ডিজায়ার'। পিয়ের ল্যা মুর-এর লেখা। তোকে কিনে দেব। পড়িস। সেদিন তুই মোৎজার্ট এর রেকর্ড নিয়ে এসেছিলি সম্বিৎদার বাড়ি থেকে। বিটোভেন শুনিস প্রায়ই, আর মেণ্ডহেলসনের নামই শুনিসনি?

শুনিনি। আমি বললাম নির্লজ্জের মতো। পরীক্ষাতে এত বাজে রেজাল্ট করার কথা বেমালুম ভুলে গিয়েই।

ফেলিক্স। নাম ছিল তাঁর ফেলিক্স মেণ্ডহেলসন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগের ইউনাইটেড জার্মানির সবচেয়ে বড় ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্কার ছিলেন ওঁর বাবা। পৃথিবীর সবচেয়ে বড়লোকদের মধ্যে একজন। ফেলিক্সের

একমাত্র সন্তান। ফেলিক্স খুব আর্টিস্টিক ছিলেন। দারুণ পিয়ানো বাজাতেন। ওঁর ইচ্ছে ছিল যে, উান কম্পোজার হবেন। পিয়ানোতে নতুন নতুন সুর সৃষ্টি করবেন।

সে ব্যবসা দেখবে না, এই কথা শুনে বাবার মাথায় তো আকাশই ভেঙে পড়ল। ছেলেও নাছোড়বান্দা। মায়ের কিন্তু খুবই ইচ্ছে ছিল যে, ছেলে কম্পোজার হোক। আসলে মায়েরা সন্তানদের যতখানি বোঝেন, বাবারা কখনও ততখানি বোঝেন না। তোর মা'রও কিন্তু উচিত ছিল. তোর আসল ভালোলাগা কোনদিকে, তা আমাকে জানানো। জানালে, তোর মন আজ খারাপ হত না। জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষাতে ফল খারাপ করতিস না।

যাই হোক, ফেলিক্সের মায়ের ইচ্ছে যেরকমই হোক, তাঁর বাবার বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য। শেষে বাবা তো ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করার ভয়ও দেখালেন। বললেন, তোমাকে সম্পত্তির এক কণাও দেব না, যদি আমার ব্যবসাতে না আসো। সাবধান।

পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে এসে ট্রাফিক লাইটে গাড়িটা দাঁড়াতে বাবা বললেন, ফেলিক্স কিন্তু শুনলেন না। যে একবার গান-বাজনার জগতের স্বাদ পেয়েছে, সাহিত্যের রসের আস্বাদ পেয়েছে, তার কাছে টাকাপয়সা কী? চলে গেলেন সব ছেড়ে। যা হতে চেয়েছিলেন, তাইই হতে। রাজার চেয়েও বড়লোক বাবার ছেলে, অতি অল্প বয়সেই যক্ষ্মা হয়ে মারা গেলেন, একটি আন-হিটেড ঘরে। ইউরোপের সব জায়গাতে তো হিটিং ছিল না তখন ঘরে ঘরে। যক্ষ্মারও চিকিৎসক ছিল না বিশেষ। কিন্তু ওই বয়সেই ফেলিক্স যা করে গেলেন, টাকা রোজগার করে নয়. ক্ষমতা একীভূত করে নয়, কিছু করার মতো করে।

আজ পৃথিবীর মানুষ কিন্তু ফেলিক্স মেণ্ডহেলসনের বাবাকে বেমালুম ভুলে গেছে, আর যদি বা মনেও রেখেছে, তাও ফেলিক্সের বাবা হিসেবেই। প্রচণ্ড পয়সাওয়ালা মস্ত ব্যবসাদার, দারুণ ক্ষমতাবান তো কত মানুষই আসে যায় পৃথিবীতে। কিন্তু তাদের মনে রাখে কে? যদি বা কেউ রাখেও, ভালোবেসে মনে রাখে, তাদের মধ্যে খুব কম মানুষকেই, মনে রাখে ঘৃণায়। "স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে", বুঝলি না!

আমি যে কোনও কিছুতেই তত ভাল নই বাবা! আমি যে মাঝামাঝি, মিডিওকার।

অসহায়ের মতো বললাম আমি।

বাবা আমার কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, "স্কুল ফাইনাল পরীক্ষাই তো জীবনের একমাত্র পরীক্ষা নয়, খোকন। যতদিন মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়, ততদিন, প্রত্যেকদিনই তাঁকে অনবরত পরীক্ষায় বসতে হয়। যতই দিন যাবে, ততই এই কথা বুঝতে পারবি। স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় যারা ফার্স্ট হয় এবং লাস্টও. তাদের মধ্যে বেশির ভাগকেই কিন্তু জীবনের মঞ্চে খুঁজে পাওয়া যায় না। জীবনের বড়-বড় পরীক্ষাতেও ওপরে উঠে আসে এই মাঝামাঝিদের ভিড়ের ভেতর থেকেই, কেউ-কেউ। যারা ননডেসক্রিপ্ট। 'জনতা' বলি আমরা যাদের।' বলেই বললেন, "চল, ফিরি এবার।"

বাবা গাড়ির এঞ্জিন স্টার্ট করবার পর আমি বললাম, "আমি যে এত খারাপ করলাম, তুমি দুঃখ পাওনি? মা খুব কেঁদেছে।"

বাবা হেসে বললেন, "তোর মা একটুতেই কাঁদেন। কাঁদলে চোখের মণি উজ্জ্বল হয় কিনা! তাই তোর মা কথায়-কথায় কাঁদেন। যাঁরা সুন্দর মানুষ তাঁরাও ওরকম অনেক কিছু করেন আরও সুন্দর হওয়ার জন্যে।"

আমার কথার উত্তর দিলে না তুমি বাবা?

আমি? না না, দুঃখ পাইনি। তবে অবাক হয়েছি। রেগে গেছি। সেটা তোর ওপরে নয়। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ওপরে। তোর মাস্টারমশাই অক্ষয়বাবুর ওপরে। আমার নিজেরও ওপরে। আমার উচিত ছিল, তোকে একটা ভালো ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া। আমার পক্ষে মোটেই তা অসুবিধের ছিল না। কিন্তু আমি চেয়েছিলাম যে, আমার দেশের লক্ষ-লক্ষ ছেলেমেয়ে যে শিক্ষার সুযোগ পায়. আমার ছেলেই বা তাদের থেকে বেশি সুযোগ পাবে কেন? তা ছাড়া বাংলা তো আমাদের মাতৃভাষাই। বেশির ভাগ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলেই বাঙালিদের সংস্কৃতি, সাহিত্য, গানবাজনা পরোক্ষে নষ্ট করে দেওয়া হয়। তুইও তেমন হয়ে উঠিস্, তা আমি চাইনি....চেয়েছিলাম বাঙালি হবি।

আমি আসলে বাজে ছেলে। আমার কিছুই হবে না। স্কুল ফাইনালেই যে খারাপ করল, তার কাছে তো জীবনের সব দরজাই বন্ধ। এই পরীক্ষাই তো প্রবেশিকা।

হাঃ হাঃ করে হাসলেন বাবা। বললেন, তোর নিজের কাছেও কি বন্ধ? আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থাটা তোতাপাখির শিক্ষা। এখানের অধিকাংশ পণ্ডিতদেরই শিক্ষার গুমোর আছে. দম্ভ আছে, প্রকৃত শিক্ষা নেই। তাছাড়া

শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে গেছে টাকা রোজগার। টাকা যাতে রোজগার করতে পারে, যেসব লাইনে বেশি টাকা আছে, সেইসব লাইনেই ভিড়। আমি চাই না তুই তেমন শিক্ষিত হোস. চাই না যে তুই টাকার অঙ্কের সঙ্গে জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে, শিক্ষাকে গুলিয়ে ফেলিস। সত্যিই আমি চাই না আমাদের দেশে টাকাওয়ালারা কোনওদিন সম্মান পায়নি। পাওয়া উচিতও ছিল না। আজ যে পাচ্ছে, তা এই ফালতু শিক্ষার ভুল চাহিদার দোষেই সরস্বতীর সাঁকো বেয়ে লক্ষ্মীর দরজায় পৌঁছতে চাইছে প্রত্যেকেই। আর লক্ষ্মী যেখানে থাকেন, সরস্বতী সেখান থেকে অভিমানে সরে আসেন। আমি কিছু মনে করিনি রে. খোকন। তুই আমার ভারি ভালো ছেলে। জীবনে ভালো হোস। মানুষ হোস, সত্যিকারের শিক্ষিত হোস, ডিগ্রি অনেক নাই-ই বা পেলি। আমি তো আর চিরদিন বাঁচব না। তোকে এই আশীর্বাদই করে গেলাম। তাছাড়া আমি নিজে তো কখনও তেমন মেধাবী ছিলাম না। তোর কাছ থেকে আমার প্রত্যাশাটা অন্যায়। এক জেনারেশানে হয় না। মেধাবী যারা, তাদের মা-বাবা ঠাকুর্দা দাদু তাঁরাও বোধহয় মেধাবীই হন।

৪

কলকাতায় এসেছিলাম পুজোর সময়। পরশু দিল্লি ফিরে যাব। আমার একমাত্র ছেলে খোকা এবার দিল্লি বোর্ডের পরীক্ষা দিল। আমি তো ভালো ছাত্র ছিলাম না। খোকাও পড়াশুনোতে মাঝামাঝিই হয়েছে। ও অভিনেতা হতে চায়। গ্রুপ থিয়েটারের দলে ঢুকেছে। টিভি-ফিল্ম নিয়ে পড়াশুনো করবার ইচ্ছে আছে। আস্ত পাগল।

অনেকগুলো বছর চলে গেছে। সত্যি অনেকই বছর। আজ মা নেই, বাবাও নেই। দক্ষিণ কলকাতার বাড়িও রামকৃষ্ণ মিশনে দিয়ে দিয়েছি আমি। দিল্লিতে থাকি এখন। আজ কুড়ি বছর হয়ে গেল। আমার স্টুডিও করেছি ভাড়া বাড়িতে, দিল্লির বাঙালিপাড়া চিত্তরঞ্জন পার্কে। ছবি আঁকি, মূর্তি গড়ি প্রদর্শনী এবং এমনিতে কিছু-কিছু বিক্রি হয়। বড়লোক হতে পারিনি ঠিকই কিন্তু বাঙালিরা আমাকে চেনেন। দিল্লির বাঙালিরা তো বটেই, ভারতবর্ষ এবং বিদেশের বাঙালিরাও। তাতে আমার কোনও গর্ব নেই। আনন্দ আছে। পয়সার লোভে সকলেই যা করে চারপাশে, যা চায় ; তাদের অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে নিজস্বতাকে এখনও খুইয়ে বসিনি যে, এইটেই আনন্দের। বাবার শিক্ষার অমর্যাদা করিনি আমি। আজকের দিনে এটা সম্ভব হত না যদি না

শ্রাবণী আমাকে সাপোর্ট করত। স্ত্রীদের উপরে স্বামীদের জীবন, জীবনের গন্তব্য অনেকখানিই নির্ভর করে। বাড়িটার দাম পেয়েছিলাম পাঁচ লাখ আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব অনেকেই বলেছিল, যে নিজের সংসার চলে না অত দাতাগিরিতে কাজ নেই। শ্রাবণী কিন্তু বলেছিল, মা-বাবাই যখন নেই তখন যা আমাদের স্বোপার্জিত নয়, তা দিয়ে সহজ সুখ চাই না আমি বড়লোকের ছেলে হলে খোকাও মানুষ হবে না। অত্যন্ত কষ্টকর হলেও বাংলা সাহিত্য, বাংলা গান, বাংলায় যা কিছু ভালো তার সঙ্গে যোগাযোগ প্রবাসে বসে আমরা এখনও রেখে চলি। এই মাঝামাঝি মিডিওকার মধ্যবিত্ত বাঙালিরাই এখনও বাঙালির যা কিছু ভালো তা প্রাণান্তকর কষ্টেই ধরে রেখেছেন বলে মনে হয় আমার। বিত্তবান বাঙালিদের অধিকাংশই বাঙালিত্বকে অসম্মান করেন, ছোট চোখে দ্যাখেন।

কলকাতায় এসে এবার উঠেছি আমার শ্যালকের বাড়িতে। খোকা আর শ্রাবণী কলকাতার পুজো দেখতে চেয়েছিল, তাই। ভাইফোঁটার পরই ফিরে যাব আবার দিল্লিতে।

আমাদের স্কুলের উলটো দিকের পার্কে ছেলেবেলায় কত ফুটবল-ক্রিকেট খেলেছি। বন্ধুদের সঙ্গে কত গল্প মজা। আজ তাই প্রথম বিকেলে একটা মিনিবাস ধরে এসেছি এখানে। একজন কিশোরের চোখে এই পার্কটিকেই কত বড় বলে মনে হত। ছোট-ছোট পায়ে এটি পার হতে হতে মনে করতাম, তেপান্তরের মাঠই পেরোলাম বুঝি! আজ পার্কে ঢুকেই মনে হল, পার্কটি খুবই ছোট। গাছগুলি উধাও হয়ে গেছে। ভিড়, বড় ভিড়। ধুলো। ছেলেবেলার সেই চোখ দুটিও তো হারিয়ে গেছে!

মন যদিও খারাপ হয়ে গেল, তবু ভাবলাম, কয়েকটি পাক হেঁটেই যাই পার্কের চারপাশের পিচ-বাঁধানো রাস্তায়।

আধ পাক যেতেই মনে হল যেন একটা বেঞ্চে লাঠি হাতে অক্ষয় স্যার বসে আছেন। ঠিক দেখলাম কি? তাঁর সামনে দিয়েই চলে গেলাম। ঠিকই চিনেছি। অক্ষয়-স্যারই। গোঁফচুল সব পেকে সাদা হয়ে গেছে। মাথায় বাঁদুরে টুপি হাতে লাঠি। মুখে পৃথিবীর সব বিতৃষ্ণা, কষ্ট। খারাপ ছাত্র পড়ানোর কষ্ট নয়, বার্ধক্যের জরার কষ্ট। গায়ে একটি নস্যি-রঙা ছেঁড়া আলোয়ান। আমাকে চিনতেও পারলেন না। না পারারই কথা। আমার মতো কত খারাপ ছাত্রকেই তো তিনি পড়িয়েছেন। খুব ভালো আর খুব খারাপ ছাত্রদেরই স্যারেরা শুধু মনে রাখেন। মাঝামাঝিরা হারিয়েই যায় তাঁদের স্মৃতিতে। বর্ষে

বর্ষে দলে দলে আসে বিদ্যামঠতলে. চলে যায়, তারা কলরবে, কৈশোরের কিশলয়, পর্ণে পরিণত হয়, যৌবনের শ্যামল গৌরবে।' কালিদাস রায়ের বিখ্যাত কবিতার লাইন মনে পড়ে গেল অক্ষয়-স্যারের চোখের ঝাপসা দৃষ্টি দেখে। ওঁকে পেরিয়ে এসেই নতুন করে মনে পড়ল যে, অক্ষয়-স্যারের মতো এতখানি অপমান আমাকে জীবনে আর কেউই করেননি। তাঁর প্রতি আমার বিদ্বেষ ছিল না। কিন্তু বুঝলাম গভীর এক উদাসীনতা জন্মে গেছে এক ধরনের। বহু বছরের দূরত্ব তা গাঢ় করেছে আরও।

আরও এক পাক ঘুরে আসার পর ওঁর সামনে দাঁড়ালাম আমি। অক্ষয় স্যারের মুখে কোনও ভাবান্তর ঘটল না। প্রণাম করে বললাম, কেমন আছেন স্যার?

ভালো নয়, ভালো নয়। কিন্তু চিনতে পারলাম না তো তোমাকে? কে?

আমি সিদ্ধার্থ স্যার। দক্ষিণ কলকাতায় থাকতাম। অঙ্ক....।

ও বুঝেছি, বুঝেছি। তা কী করছ এখন তুমি সিদ্ধার্থ?

ছবি আঁকি স্যার। মুর্তি গড়ি।

পেট চলে তাতে? আর্টিস্টরা তো না খেয়েই থাকে শুনি।

কোনওক্রমে চলে যায় স্যার।

তা ভালোই করেছ। অঙ্ক তোমার লাইন ছিল না। অঙ্কে মাথা লাগে। অঙ্ক....

জানি। একটু চুপ করে থেকে বললাম, গোপেনদা কী করছেন স্যার?

মানে, আমার ছেলে গোপেনের কথা বলছ?

হ্যাঁ।

ও? অক্ষয়-স্যারের ম্লান, করুণ, কাতর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, গোপেন তো ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিল। জানো তো? ম্যাথমেটিক্সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিল। তারপর চলে গেল নতুন করে ফিজিক্সের লাইনে। নিউক্লিয়ার ফিজিক্স। এখন আমেরিকার হিউস্টনে আছে। আরে, নেভাদার মরুভূমিতে যে বোমা ফাটাল সেদিন আমেরিকা, সে তো তার একারই হাতে গড়া!

এমন করে বললেন, অক্ষয়-স্যার, যেন উড়নতুবড়ি বানানোর কথাই বলছেন। গোপেনদা যেন একা হাতে মশলা আর লোহাচুর ভরে উড়নতুবড়িই বানিয়েছেন একটা। আলোর ছটার জন্যে নয়, পৃথিবীর যা কিছু ভালো, সব ফুল, পাখি, প্রজাপতি, অরণ্য মানুষ সব-কিছুকেই ধ্বংস করার জন্যে।

দারুণ আছে। বুঝলে হে। বিরাট বাড়ি। ক্যাডিলাক লিমুজিন গাড়ি।

আমেরিকান মেয়ে বিয়ে করেছে। কী ফুটফুটে মেমসাহেব। নাতি-নাতনিরাও সব ফুটফুটে। পাক্কা সাহেব। বাংলা বলতেই পারে না।

গর্ব ঝরল অক্ষয়-স্যারের কথায় বসনতুবড়ির ঝরনার মতো।

আপনি যাননি? ওঁরা আসেন না?

কী যে বলে! আমার কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের বাড়িতে ইণ্ডিয়ান বাথরুম। পায়রার খোপের মতো দু'খানা ঘর। জঞ্জালে ভরা। ওখানে ওরা থাকবে কী করে? তুমি যেমন অঙ্কে গবেট ছিলে, ও ছিল তেমনই সত্যিই ব্রিলিয়ান্ট। জানো তো স্কুল ফাইনালে স্টার পেয়েছিল। অঙ্ক, সংস্কৃত আর ভূগোলে লেটার পেয়েছিল। ইতিহাসেও।

আপনি এখনও কি পড়ান স্যার? আর মাসিমা মানে, গোপেনদার মা কেমন আছেন?

"উনি গত হয়েছেন পাঁচ বছর হল।"

একমাত্র ছেলের প্রশংসাতে উজ্জ্বল মুখ হঠাৎই নিভে গেল অক্ষয় স্যারের। বললেন, "বড় কষ্ট পেয়ে, বিনা শুশ্রূষাতে, বিনা চিকিৎসাতেই প্রায় চলে গেলেন। আমিও তো পা বাড়িয়েই আছি, বুঝলে। টিকিট কাটা হয়ে গেছে। শুধু বার্থটাই রিজার্ভেশন হয়নি। বাত, হাঁপানি, দুটো হার্ট অ্যাটাক। আছি কোনওরকমে। একে থাকা বলে না?"

তা হলে এখন আর ট্যুইশানি, করেন না? স্কুল থেকে তো নিশ্চয়ই বহু বছর রিটায়ার করেছেন?

পঁচিশ বছর। ট্যুইশানি—তা করি নিশ্চয়ই করি। নইলে চালাচ্ছি কী করে? কেন তোমার ছেলেও বুঝি তোমারই মতো অঙ্কে কাঁচা?

আমি হাসলাম। কষ্ট হল অক্ষয়-স্যারের জন্যে।

উনি বললেন, এখন থাকো কোথায়? ওই বাড়িতে তো অন্যরা থাকেন। ওই পাড়াতে আমার একটি ট্যুইশানি ছিল। তাই জানি। তুমিই বলো, সকালে অথবা দুপুরে আমি নিশ্চয়ই গিয়ে পড়াব যত্ন করে। রাতে আর কোথাও যাই না। ছেলের চেয়েও যেমন নাতি আদরের, ছাত্রর চেয়ে ছাত্রর ছেলেও তেমনই।

তা এই বয়সেও এত কষ্ট করেন কেন, গোপেনদা এত বড় এবং বড়লোক হয়েছেন। আপনাকে প্রতি মাসে টাকা পাঠান তো নিশ্চয়ই। এসব তো ছেড়ে দিলেই পারেন। এই শরীরে। আর কতদিন কষ্ট করবেন?

একটু চুপ করে থেকে অক্ষয়-স্যার গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, অভাব

আমার কিছুই নেই তবে একেবারে বসে গেলে শরীরটা আর চলবে না। তাই-ই চালিয়ে যাচ্ছি টুকটুক করে।

আচ্ছা চলি স্যার।

তোমার ছেলে? প়বে না সে আমার কাছে?

অঙ্ক ও পড়বে না স্যার। অভিনয় করবে বলছে।

অক্ষয়-স্যারের মুখটি, আমার অঙ্ক দেখে যেমন বিকৃত হয়ে যেত তিরিশ বছর আগে, তেমনই বিকৃত হয়ে গেল। বললেন, লাইক ফাদার লাইক সান। ও তো তোমারই মতো গাধা হয়েছে তা হলে। অঙ্কে গবেট?

হেসে বললাম, তাই।

সন্ধে হয়ে এল। আলো জ্বলে উঠেছে। পার্ক থেকে বেরিয়ে আসছি, এমন সময়ে আমার স্কুলের বন্ধু রাজেনের সঙ্গে দেখা চিনতেই পারিনি। বুড়ো হয়ে গেছে। সিনেমায় নামবে বলে বাবার আলমারি ভেঙে টাকা নিয়ে এই রাজেনই বোম্বে যাচ্ছিল। পুলিশ ধরে আনার পর স্কুল থেকে রাস্টিকেট করে দিয়েছিল ওকে। ওর নাম ধরে ডাকতেই, আমার নাম বলতেই, বুকে জড়িয়ে ধরল রাজেন। বলল, কী রে সিদু? কীরকম বুড়ো মেরে গেছিস তুই।

আর তুই কি কচি আছিস নাকি? টেকো বুড়ো। আমি বললাম।

হেসে ও বলল, চল চল আমার দোকানে। বিকেলে একটু হাঁটতে বলেছেন ডাক্তার। দোকানে বসে বসে ডায়াবিটিসে ধরেছে বুঝলি। চল, চল, দোকানের পর আমার বাড়িতে। সীমা কত্ত খুশি হবে। বাড়ির একতলাতেই তো দোকান।

কিসের দোকান?

আবার কিসের? স্টেশনারি দোকান দিয়েছি বাড়ির একতলাতে। আমি আর কী করব? সংসার তো চালাতে হবে।

মেসোমশাই কেমন আছেন?

বাবা নেই। অনেক চেষ্টা করলাম রে। সব সঞ্চয়, মায়ের, এমনকী সীমারও সব গয়না, আমার স্কুটারটা পর্যন্ত বিক্রি করেও তবু বাঁচাতে পারলাম না।

কী হয়েছিল?

ক্যান্সার।

মাসিমা কেমন আছেন?

বুড়ো হয়ে গেছেন। কিন্তু ভালোই আছেন। চল, চল, তোকে দেখে কত্ত খুশি হবেন। তুই বিজয়ার পর মায়ের হাতের কুচোনিমকি আর নারকেলের নাড়ু খেতে ভালোবাসতিস। চল, এখনও কিছু আছে। আজকাল বিজয়া টিজয়া তো উঠেই গেছে। আমেরিকান হয়ে গেছি আমরা। কী বলব তোকে, এই শ্রীমান রাজেন দাসের একমাত্র ছেলেও ইংরেজি গান আর ইংরেজি বই ছাড়া পড়ে না। ইংরেজি নাচ নাচে।

কী করছে ও?

চোরের ছেলে আর কী করবে? ডাকাত-টাকাত হবে হয়তো। এখন কবিতা লিখছে। বাবা তো লক্ষপতি। লিটল-ম্যাগ আন্দোলনে সামিল হয়েছে ছেলে।

আরে হোক হোক। ওর জীবন ওর। বাধা দিস না। আমি বললাম।

দোকানেই আগে নিয়ে গেল রাজেন। খুব মজা লাগল যে, বোম্বের বৈজয়ন্তীমালার বিরাট একটি ছবি টাঙানো আছে দোকানের দেওয়ালে। তাতে চন্দন-টন্দনের ফোঁটা দেওয়া।

বললাম, এ কী রে? যাকে বিয়ে করবি বলে পালিয়েছিলি!

রাজেন হেসে বলল, কী বলিস তুই? যার জন্যে পুলিশের ঠ্যাঙানি খেয়ে বুকের হাড় ভাঙল, চোর বদনাম হল, তাকে কি ফেলে দিতে পারি? বাবা মাকে যেমন ফেলে দেওয়া যায় না, একেও তেমনই।

বলে, নিজেই হো হো করে হেসে উঠল।

রাজেনের মা খুবই খুশি হলেন। রাজেনের বউ সীমা বলল, "আপনাকে আজ না খেয়ে যেতেই দেব না। যা রান্না হয়েছে গরিবের বাড়ি, তাই খেয়ে যেতে হবে। এত বড় আর্টিস্ট আমাদের বাড়ি এসেছেন। আপনাকে কখনও চোখে না দেখলেও আমার স্বামীর বন্ধু বলেই কত্ত মানুষের কাছে গর্ব করি। আপনার গর্বে আপনার বন্ধু তো মাটিতে পা'ই পড়ে না।"

বলেই বললেন, "দোকানঘরের দেওয়ালগুলো দেখে এসেছেন তো?"

হেসে বললাম, দেখিনি আবার!

সীমা হেসে গড়িয়ে বলল, ফোটোর সতীনকে নিয়ে কোনও ঝামেলা নেই, আমিও ফুলটুল দিই মাঝেমধ্যে।

অক্ষয়-স্যারের সঙ্গে দেখা হল রে, বুঝলি রাজেন। আমি বললাম রাজেনকে।

তাই? আমার সঙ্গে তো রোজই হয়। দোকানেও বলে রেখেছি যে,

রোজকার পাঁউরুটি যেন বিনে পয়সায় দিয়ে দেয় ওঁকে। গুরু-ঋণ বলে কথা! রাস্টিকেড ছাত্রই হই আর যাইই হই। কী কানমলাই না দিতেন! মনে আছে? ও তুই তো আমার চেয়ে অনেক ভালো ছিলি অঙ্কে। বাঁ কানটা চিরদিনের মতো হাফ-কালা হয়ে গেছে রে। একেবারে রগে রগে ঘষাঘষি করতেন অক্ষয়-স্যার!

গোপেনদা কিন্তু দারুণ ভালো ছিল। স্যারের কাছে শুনলাম যে, বিরাট নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট হয়েছেন আমেরিকায়....আমি বললাম।

তা তো হয়েছেন! কিন্তু মা মারা গেলেন বিনা চিকিৎসায়। বিনা ওষুধে। অঙ্কে দারুণ খারাপ ছেলে পাঁউরুটি দান করে বুড়ো বাবাকে তার বাঁচিয়ে রেখেছে। অমন ভালোর দাম কী বলতে পারিস? একটা টাকাও পাঠায়নি বিদেশ যাওয়ার পর থেকে। একবারও আসেনি।

অক্ষয় স্যারের ট্যুইশনি তো আছে এখনও কয়েকটা?

ছাড় তো! ট্যুইশানি। এখনকার দিনে কি আর তৈলাক্ত বাঁশে বাঁদরের ওঠার অঙ্ক করতে হয়? না শুভঙ্করী মুখস্থ করতে হয়, কে পড়বে ওঁর কাছে। এখন অঙ্ককে অঙ্ক বলে না। বলে 'ম্যাথস'। সীমাকেই জিজ্ঞেস কর না। স্যার পটকে যখনই যান, তখন শুশ্রূষা করে সীমাই, ফ্লাস্কে করে পথ্য নিয়ে গিয়ে। যত ঝামেলা এই রাস্টিকেটেড ছাত্ররই। সত্যি! যাকগে, আমি যেমন ছাত্র ছিলাম আমার ছেলেমেয়ে তার তুলনায় অনেকই ভালো। এইই স্যাটিসফ্যাকশান!

মাসিমার হাতে বানানো কুচোনিমকি, আর নারকেল নাড়ু, সীমর রান্নার লুচি বেগুনভাজা কুমড়োর ছেঁচকি আর ডিমের ঝোল খেয়ে যখন প্রায় দশটা নাগাদ রাজেনের সঙ্গে বাসস্ট্যাণ্ডে এলাম, তখন ভারি ভালো লাগছিল। অঙ্কে আমরা কেউই যে ভালো ছিলাম না, এটা মনে করে সত্যিই আনন্দ হচ্ছিল।

রাজেনকে বললাম, সীমাকেও বলে এসেছি, আগামী শীতে সবাইকে নিয়ে দিল্লি আয়। মাসিমাকেও নিয়ে আসিস। একটু অসুবিধে হলেও তোদের আনন্দ হবে খুব।

রাজেন বলল, খুব চেষ্টা করব। কী বলব তোকে, বিয়ের পর সীমাকে একবার দীঘা ছাড়া আর কোথাওই নিয়ে যেতে পারেনি। কত্ত যে ঝামেলা। আর রোজগার তো লবডঙ্কা!

বললাম, "থ্রি-টায়ারে করে চলে আয়। স্টেশনে তোদের রিসিভ করার

পর থেকে সব দায়িত্ব আমার।"

বাস এসে গেল। বললাম, চলি রে।

শীত কিছুই পড়েনি। তবে কলকাতার মানুষেরা তো ক্যালেণ্ডার দেখে গরম জামা পরেন। তাছাড়া ধোঁয়াশা আর ডিজেলের ধোঁয়ার কলকাতাকে এখন মনে হচ্ছে শীতের লণ্ডন। দু-বছর আগে এগজিবিশন নিয়ে গিয়েছিলাম ওখানে। তাই জানি।

পরের স্টপে ঠিক অক্ষয়-স্যারের মতো এক ভদ্রলোক উঠলেন। মাথায় বাঁদুরে টুপি। হাতে লাঠি। তবে বয়স অত হয়নি। বাস হঠাৎ ছেড়ে দিতেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। উঠে দাঁড়িয়ে ওকে আমার সিটে বসালাম।

উনি মুখে কিছু বললেন না। কৃতজ্ঞতার চোখে তাকালেন।

তোতাপাখির 'থ্যাঙ্ক ইউ' আমার দেশের ঐতিহ্য নয়। আমরা চোখ দিয়েই জরুরি কথা অনেক বেশি গভীরভাবে চিরদিনই বলে এসেছি। ওই বৃদ্ধও তাই করলেন।

আমি বেঁটে লোক। মিনিবাসের রড ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না। কলকাতার পাবলিক বাসে দিল্লির পাবলিক বাসের চেয়ে অনেক কম ভিড়। দিল্লি হচ্ছে বড়লোক চাকুরে আর ব্যবসাদারদের সুখের জায়গা। মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্তদের বিস্তরই অসুবিধে সেখানে। ভাবছিলাম, বাড়িটা দান করে দেওয়া বোধহয় ঠিক হয়নি। কলকাতাতে থাকলেই হত। বাঙালি মধ্যবিত্তের পক্ষে এখনও কলকাতার মতো নিরাপদ ও সুখের জায়গা আর নেই।

কণ্ডাকটারকে একজন যাত্রী বললেন, এটা কী হল দাদা? অঙ্কটা কিরকম হল? দিলুম পাঁচ টাকার নোট, যাব শ্যালদা, আর ফেরত দিলেন এই? অঙ্কের জ্ঞানটা একটু ভালো করুন।

অক্ষয়-স্যারের কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমার। নস্যি নিয়ে, অঙ্ক-কষিয়ে, ছাত্রদের কান মলে, গালাগালি করে, প্রত্যেককে অঙ্ক-বিশারদ করতেই কাটিয়ে দিলেন সারাটা জীবন মানুষটি।

কিন্তু নিজের জীবনের অঙ্কটাই, একটা মাত্র অঙ্ক, অতি সাদামাটা অঙ্ক, তাও মিলল না। ❑

কাড়ুয়া

কাড়ুয়াকে নিয়ে এর আগেও বহু জায়গাতে লিখেছি কিন্তু তবু মন ভরেনি। তার কথা সব সময়েই মনে হয়। যখনই একা থাকি সে হাজারীবাগের প্রত্যন্ত এক জঙ্গলঘেরা গ্রামের পটভূমিতে তার হাসিভরা মুখটা নিয়ে দেখা দেয়।

আমার হাজারীবাগের সব শিকারি বন্ধুই একে একে চলে গেছে। আমি একা আছি। তাদের যাওয়ার এত তাড়া কী ছিল জানি না।

সবচেয়ে আগে গেছে ইজাহার, মহম্মদ ইজাহারুল হক। সে হাজারীবাগ আর সীমারীয়ার মধ্যের একটা ছোট্ট গ্রাম টুটিলাওয়ার জমিদার ছিল। সে যখন মারা যায় তখন তার বয়স পঁয়ত্রিশ হবে। তারপরে কাড়ুয়ার ছোট ভাই

আসোয়া। তারপরে মহম্মদ নাজিম, মহম্মদ সাবির, তারপরে মিহির (গোপাল সেন)। গোপাল চলে যাবার কিছুদিন আগে যায় কাড়ুয়া।

চলে যাওয়া মানুষদের ফিরিস্তি কেন দিচ্ছি এ কথা তোমাদের মনে হতেই পারে। কিন্তু আমার হাজারীবাগের কথা মনে হতেই ওদের সকলের কথাই মনে আসে একসঙ্গে। পরিযায়ী পাখিদের মতো ভিড় করে।

হাজারীবাগ থেকে চাতরা, গয়া এবং ডালটনগঞ্জ যেতে যে একটি লাল মাটির ঢেউখেলানো পথ ছিল আমাদের সময় *(ঢেউখেলানো মানে Corrogated)*। কারোগেটেড শিট এর মতো ছোট ছোট লাগাতার ঢেউয়ে ভরা ছিল) সে পথ চলে গেছিল গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সীমারীয়া হয়ে বাঘড়া মোড় হয়ে চাঁন্দোয়াটোড়ি হয়ে রাঁচী, নেতারহাট ও ডালটনগঞ্জ। অন্যদিকে চাতরা হয়ে গয়া। এই পথেই হাজারীবাগের কাছেই পথের বাঁদিকে বনাদাগ নামের একটি গ্রাম ছিল। তার প্রায় উল্টোদিকে ছিল পাহাড়ের মতো গোন্দা বাঁধ। গোন্দার রাজার দেওয়া মস্ত উঁচু বাঁধ। বনাদাগ থেকে একটা পায়ে-চলা পথ চলে গেছিল কুসুমভা। এই কুসুমভা গ্রামের একটি বিশেষ পরিচিতি আছে। অগ্রজ ও শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ মশায় যখন হাজারীবাগ—চাতরা লাইনে গভীর জঙ্গলে-ঘেরা পথে রাতের বেলা লাল মোটর কোম্পানির বাস কণ্ডাক্টরি করতেন তখন এক রাতে তিনি একটি বাঘের বাচ্ছা কুড়িয়ে পান পথে। সেই বাঘটিকে তিনি পরম যতনে পুষে বড় করেন। কিন্তু বড় হয়েই সে তার নিজের স্বভাববশে মানুষ ও নানা গৃহপালিত প্রাণীকে আক্রমণ করতে থাকে। তখন নানাজনের প্রতিবাদে সুবোধবাবু ওই বাঘটিকে এক রাতের বেলা বাড়ি থেকে বকলেস বাঁধা অবস্থাতে দু-বন্ধুর সঙ্গে এসে ওই কুসুমভা গ্রামের উপান্তে একটি মস্ত বটগাছের নীচে ছেড়ে দেন। বাঘ যেতে চায়নি। বারেবারে তাঁর পেছনে পেছনে ফিরে আসতে চায়। শেষকালে তাকে জঙ্গলে চলে যেতে বাধ্য করা হয়।

এই কুসুমভা গ্রামের বটগাছটার নীচে আমরা বন্ধুরা কত যে দিন রাত কাটিয়েছি সেখানে শিকারে গিয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। ঐ গাছটা ছিল গাঁয়ের শেষ সীমানা। তারপরই গভীর জঙ্গল শুরু হয়ে যায়, পানুয়ান্না টাঁড় অবধি। কাড়ুয়ার বাড়ি ছিল ওই কুসুমভাতে।

অত্যন্ত কুৎসিতদর্শন, মাঝারি উচ্চতার, খাটো ধুতি ও ছিটের শার্ট পরা, গরমের সময়ে খালি গা, খালি পায়ের কাড়ুয়া। তার মাথাতে ছিল দেড়

আঙুল টিকি। তার মাথার চুল, কী কারণে জানি না, ছিল আফ্রিকানদের মতো ছোট ও কোঁকড়া, উলের কার্পেটের মতো। ভালোমানুষী মুখময় লেখা ছিল। অত্যন্ত গরিব কিন্তু লোভী নয়, অভাবী কিন্তু চোর নয়। তার নিজস্ব বলতে কোনও কিছুই ছিল না একটা একনলা মুঙ্গেরি গাদা বন্দুক ছাড়া। অথচ আমাদের সবকিছুই ছিল, কত ভালো ভালো জামা জুতো, দামি দামি বন্দুক, চশমা, টুপি। কাড়ুয়া কৌতুকভরে সেগুলোর দিকে চেয়ে থাকত কিন্তু তার চোখে কোনও দিন লোভ দেখিনি। মাঝে মাঝে আমার বা গোপালের বিলেতি বন্দুক বা রাইফেল হাতে নিয়ে কোনও গাছকে নিশানা করে বলত, বাপ্পা লো বাপ্পা! এইসান একঠো হামারা রহনেসে গোলি অন্দর জান বাহার করতাথা।

কাড়ুয়ার জন্য আমরা জামাকাপড় নিয়ে যেতাম। তার কিছু সে নিত, বেশিই ফেরত দিত। বলত, এত কী হবে! জুতো কোনওদিনই পরত না। হাজারীবাগের অসহ্য শীতের রাতে খালি পায়ে সে আমাদের সঙ্গে মাইলের পর মাইল বন্দুক কাঁধে হেঁটে বেড়াত পাল্‌সা শিকারে।

ওদের কুসুমভা গ্রামের এক কোণে একটা নতুন পুকুর খোঁড়া হয়েছিল। তখন বর্ষাতে তার জল ছিল ঘোলা লাল। ওরা বলত "নয়া তালাও"। তারই পাশে শটিক্ষেতে একটা মস্ত বড় দাঁতাল শুয়োর আসত এবং শুটি যত না খেত ক্ষেত লণ্ডভণ্ড করত তার চেয়ে বেশি। ওই শুয়োরটা প্রতি শনিবার শনিবার আসতই। ওই শুয়োরটার ওপরে ভীষণ রাগ ছিল কাড়ুয়ার। কারণ, সে তার বন্ধু বিশ্বেশ্বরোয়ার পেট ফাঁসিয়ে দিয়েছিল তাকে কচু ক্ষেতে উপড়ে ফেলে। রক্তক্ষয়ে মারা যায় বিশ্বেশ্বরোয়া।

কাড়ুয়ার গাদা বন্দুকটা তার মাটির ঘরের দেওয়ালে একটা মোটা কাঠের পেরেকের থেকে ঝোলানো থাকত। শন-এর দড়ি দিয়ে বানানো হয়েছিল সেই বন্দুকের স্লিং (Sling)।

শুয়োরটাকে মারবার অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই তাকে মারতে পারছিল না কাড়ুয়া। ধূর্ত শুয়োরটা প্রতিবারই কাড়ুয়াকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেত।

গোপাল, ভোপালের মহারাজার কাছ থেকে একটা বন্দুক কিনেছিল। সরাসরি কেনেনি। গান-ডিলারের মাধ্যমে কিনেছিল। সেই বন্দুক নিয়ে গোপাল হাজারীবাগে আসছে এ খবর পেয়েই কাড়ুয়া একটা ছড়া বানিয়ে ফেলল। ছড়াটা আসলে কাড়ুয়া বানায়নি, বানিয়েছিলাম আমিই কিন্তু মনের কথাটা কাড়ুয়ারই!

"রে রে শুয়ারোয়া বড়কা শুয়ারোয়া
ক্যা কহি তুমহারা বাত
চুপকে চুপকে গাঁওমে ঘুষতা
হর শনিচ্চর রাত।
গোপালবাবু লায়া ভোপালসে বন্দুক
অব নিকাল লেগা তেরা দাঁত
রে রে শুয়ারোয়া, বড়কা শুয়ারোয়া
ক্যা কহি তুমহারা বাত।"

একদিন, দিন নয় রাত, সন্ধ্যেবেলা টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। বর্ষার রাত, সকাল সকাল কাড়ুয়া তার বৌ আর ছেলেকে নিয়ে কাঁথা গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছে। হাজারীবাগ জেলাতে বর্ষাকালে বেশ ঠাণ্ডা থাকে রাতে। এমন সময়ে কাড়ুয়া শুনতে পেল তার বন্দুকটা তাকে ডাকছে। বলছে, এ কাড়ু—কাড়ু রে-এ-এ-এ।

ঘুম ভেঙ্গে যাওয়া কাড়ুয়া চোখ বন্ধ করেই কান খাড়া করে শুনল বন্দুক বলছে—শটি ক্ষেতোয়ামে শুয়ার আওল থু। বড়কা শুয়ারোয়া।

কাড়ুয়ার মনে পড়ে গেল আজও শনিবার রাত। সঙ্গে সঙ্গে সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বন্দুকটা দেওয়াল থেকে পেড়ে নিয়ে আড়াই আঙুল বারুদ তাতে 'হুম্মচ্‌কে' ঠেসে তার সামনে একটা শিসের গুলি—কাচের মার্বেল এর মতো, গেদে দিয়ে বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল নয়া তালাও-এর দিকে। নিঃশব্দে সেখানে পৌঁছে একটা জংলি ঘোড়া নিম গাছের নীচে দাঁড়িয়ে শুনতে পেল শুয়োর ক্ষেত লণ্ডভণ্ড করছে তার দাঁত আর চার পা দিয়ে। খুব সাবধানে নিচু হয়ে শটি ক্ষেতের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল কাড়ুয়া। শুয়োরের সঙ্গে চোখাচোখি হলেই সে ভেগে পড়ার মতলব করল। কিন্তু কাড়ুয়া বিশ্বেশ্বরোয়ার মৃত্যুর বদলা নিল শুয়োরের বুক লক্ষ্য করে গুলি করে। গুলি খেয়ে শুয়োরটা সব্জি ক্ষেতে পড়ে চরকিবাজির মতো ঘুরপাক খেতে লাগল।—ভিজে মাটি আর শটি ছিটিয়ে চতুর্দিকে। সেখানেই দাঁড়িয়ে দেখল কাড়ুয়া—আর গুলি করবে কী করে!—গাদা বন্দুকে ঝট করে আবার গুলি করা যায় না বন্দুকে নতুন করে বারুদ না গেদে—তাই দেখতেই লাগল তার বন্ধুর হত্যাকারী শয়তানের শেষ।

কাড়ুয়াকে নিয়ে একটি বই লেখা যায়, লেখা উচিতও, আমার আঁকা রঙিন ছবি সমেত। প্রায়ই ভাবি কিন্তু হয়ে ওঠেনি। ❑

যমদুয়ারের ছোকরা বাঘ

জায়গার নাম যমদুয়ার। তার নৈসর্গিক দৃশ্যের তুলনা হয় না। একপাশে ভূটান পাহাড়, অর্থাৎ হিমালয় পর্বতমালা, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার সবুজ সীমারেখা, আর একদিকে আসাম—সেখানে আমরা আছি। বনবিভাগের দোতলা বাংলোটি একেবারে সংকোশ নদীর দিকে মুখ-চাওয়া। সংকোশ নদীই বাংলা আর আসামের সীমানা দেখিয়ে বয়ে চলেছে এখানে। বড় সুন্দর নদী, নদীময় বড় বড় পাথর। স্বচ্ছ জলে কালো ছায়া ফেলে মাছের দল সাঁতরে চলেছে। সারাক্ষণ কুলকুল করে গান গাইছে সংকোশ।

সঙ্গে আছে স্থানীয় সাত্তার, পুরো গোয়ালপাড়া জেলার লোকেরা একে জানে 'ছাত্তার ভাই' বলে। নাম আবু সাত্তার। সত্যিই বড় ভাল শিকারি। এ পর্যন্ত ও কত যে বাঘ, চিতা, কুমির ইত্যাদি মেরেছে তার আর লেখাজোখা নেই।

দুবেলা খাই দাই, রাইফেল কাঁধে ঘুরে বেড়াই—বাঘের পায়ের দাগের খোঁজ করি। এ পর্যন্ত বাঘের হদিস পাওয়া গেল না। দু-একদিনের মধ্যে মোষ বেঁধে বসব-ভাবছি জঙ্গলে। বাঘের হদিস পাওয়া না গেলেও, বাঘ যে পথে মাঝে মাঝে সংকোশে জল খেতে যায় সে পথটা সাত্তার আর আমি খুঁজে বের করলাম একদিন। তারপর ঠিক করলাম, একদিন বিকেলবেলা গিয়ে সেই পথের ধারের কোনো গাছে বসব, যদি বরাতে বাঘের দেখা মেলে।

বসলাম গিয়ে একদিন। বাংলো থেকে পাহাড়ী সুঁড়িপথ প্রায় মাইল তিনেক। নদীর ধার দিয়ে রাস্তা। রাস্তায় দুটো বড় বড় খাদ থাকাতে জীপ যাওয়া মুশকিল। তাছাড়া জীপ নিয়ে যেখানে বসব সেখান অবধি যাওয়াটা ঠিক হবে না। হেঁটে পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। সাত্তার বলল, 'কপালে থাকলে এখনই আসবে বাঘ।'

উঠে বসলাম একটা খয়ের গাছে। দেখতে দেখতে আমাদের পিছনে, সংকোশের দুধলি-বালি আর স্বচ্ছ জল পেরিয়ে ভুটান পাহাড়ের আড়ালে সূর্যটা ডুবে গেল।

আস্তে আস্তে রাত নামল। রাত বাড়তে লাগল। এখন চারদিকে ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। গরমের সময় জঙ্গলে ফুরফুর করে হাওয়া দিচ্ছে। কিছু দূরে ভুটানের পর্বতমালা পূর্ণিমার রাতে আলোর ওড়না মুড়ে ঘুমোচ্ছে। আমাদের পেছন দিয়ে সংকোশের স্রোত বয়ে চলেছে, একটানা কল কল শব্দ করে।

রাত প্রায় নটা বাজে। জ্যোৎস্নামাখা বন-পাহাড়ের যে একটা মিষ্টি ঠাণ্ডা আমেজ আছে সেটা একেবারে বুকের মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় আমাদের সামনে প্রায় দুশো গজ দূরে একদল ভারী জানোয়ারের পায়ের আওয়াজ পেলাম। আমরা যে গাছে বসেছিলাম ঠিক তারই তলা দিয়ে জানোয়ারদের চলার সুঁড়িপথ গেছে। শব্দ শুনে মনে হল, যাদের পায়ের আওয়াজ শোনা গেল, তারা এই পথেই আসবে। সাত্তার ফিসফিসিয়ে কানে কানে বললে, 'সেই জংলী মোষের দল, যাদের কথা আপনাকে বলেছি। সংকোশে জল খেতে চলেছে।'

সাত্তারের কাছে শুনেছিলাম যে, এই রাঙ্গা ব্লকে, যে ব্লকে আমরা বাঘ মারার জন্যে বনবিভাগের অনুমতি নিয়েছি, তাতে নাকি একদল দেখবার মতো জংলী মোষ আছে। ভেবেছিলাম পূর্ণিমা রাতে যদি বাঘ গাছের নীচে

একবার চেহারা দেখায়, তাহলে গুলি করতে বিশেষ অসুবিধা হবে না। কিন্তু বাঘের আগে এসে জংলী মোষের দলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

ততক্ষণে শব্দটা এগিয়ে আসছে। শক্ত ভারী পায়ের ইতস্তত আওয়াজ। কখনো থামছে, কখনো এগোচ্ছে। আমাদের গাছের বাঁ দিকে প্রায় পঁচিশ গজ দূরে, সেই সুঁড়িপথে একটা বাঁক ছিল। দেখতে দেখতে সেই বাঁকের মুখে এসে দাঁড়াল এক অতিকায় প্রাণী। বনের পটভূমিকায় চাঁদের রূপোলী আলোয়, বলিষ্ঠতার প্রতিমূর্তির মতো এসে দাঁড়াল দলপতি। দলপতি হবার যোগ্যই বটে। মাথার সিং দুটো দুখানা অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক হাতের মতো, সামনের সমস্ত কিছুকে আঁকড়ে ধরার জন্য যেন হাত বাড়িয়ে আছে। গায়ের রঙ লাল-কালোর মাঝামাঝি। একটা প্রকাণ্ড মাথা।

মোষের দলের আমাদের দেখতে পাবার কোনো কথা ছিল না, দেখেওনি। পুরো দলটা নিজেদের মনে নীচের শুকনো পাতা-পড়া, পথে, খচমচ আওয়াজ তুলে সংকোশের দিকে চলে গেল। মারতে চাইলে অতি সহজে মারা যেত। অত বড়ো মাথা, এবং অত ধীরে ধীরে চলন। কিন্তু জংলী মোষ মারতে আমরা যাইনি সেবারে। তাছাড়া মোষ মারার অনুমতিও ছিল না। তবু দেখা তো হল। সেই বা কম কী?

মোষের দল যখন এখনই জলে গেল, তখন বাঘের এখনই এদিকে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই মনে করে সে রাতের মতো আমরা গাছ থেকে নেমে, হেঁটে যমদুয়ারের বাংলোয় এসে পৌঁছলাম।

সকালে দরজায় ধাক্কা দিয়ে চৌকিদার ঘুম ভাঙাল। দরজা খুলে কী ব্যাপার জিগ্‌গেস করাতে সে বাংলোর নীচে, রান্নাঘরের পাশে, মাটিতে গোল হয়ে বসে থাকা চার-পাঁচ জন লোকের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল। নীচে নামতেই ওরা বলল, 'সাহেব, এক্ষুনি একবার যেতে হবে আমাদের সঙ্গে।' জঙ্গলের মধ্যে, ভূটানের সীমানার একেবারে পাশেই ওদের মোষের বাথান। সেখানে কুড়ি-বাইশটা মোষ থাকে। ওরা মোষ চরায়, আর দুধ থেকে ঘি করে সংকোশের ওপারে ভূটানের হাটে বিক্রি করে। ওরা বললে, 'কাল শেষ রাতে একটা বাঘ এসে বাথানের চারপাশে ঘোরাঘুরি করতে থাকে—আর ডাকাডাকি করতে থাকে। কিন্তু মোষগুলো সব একসঙ্গে থাকাতে প্রথমে কিছু করতে সাহস পায় না। কিন্তু একটা মোষের অসুখ হওয়াতে, অন্য মোষেদের থেকে আলাদা করে, বাথানের বাইরে, ঘরের পাশে একটা শাল গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছিল। কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে, বাঘ মুহূর্তের

মধ্যে সেই মোষটাকে মেরে দড়ি ছিঁড়ে ওদের ঘর থেকে মোটে পঁচিশ-তিরিশ গজ দূরে কতকগুলো জার্মান-জঙ্গলের মধ্যে (বিহারে যাকে বলে পুটুস) নিয়ে গিয়ে খেতে আরম্ভ করল। ওরা বললে, ওদের জীবনে ওরা এরকম দুঃসাহসী বাঘ দেখেনি। ঘরের মধ্যে থেকে ওরা কড়মড় করে হাড় চিবোনোর শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। প্রতিকারে কী যে করবে তা ভেবেই ঠিক করতে পারছিল না। শেষে ওরা সবাই মিলে সাহসে ভর করে ঘরের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ ধরে কেরোসিনের টিন বাজানো ও চেঁচামেচি করার পর তিন-চারটে মশাল জ্বেলে, হঠাৎ ঘরের দরজা খুলে জ্বলন্ত মশালগুলো বাঘের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে আবার দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর সে কি কাণ্ড! একে বাঘ খিদের মুখে খাচ্ছিল, তায় জ্বলন্ত মশাল গিয়ে পড়েছে তার ঘাড়ে। পনের মিনিট সে এক প্রচণ্ড অবস্থা। বাঘের বিকট গর্জন, বাথানের মোষেদের গলার ভারী ঘণ্টার সঙ্গে মেশা সমবেত ভয়ার্ত চিৎকার। সব মিলে বেচারাদের প্রাণ উড়ে যাবার অবস্থা।

তাদের জিগ্‌গেস করলাম যে, মোষটার অবশিষ্টাংশ ওখানেই আছে না বাঘ যাবার আগে অন্য জায়গায় টেনে নিয়ে গেছে? ওরা বলল, মোষটাকে বাঘ ওখান থেকে আরো একশ গজ দূরে নিয়ে গিয়ে একটা বেতের ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে। বোধহয় সবটা খেতে পারেনি।

তক্ষুণি আমি আর সাত্তার জীপে উঠে বসলাম। প্রায় সাত-আট মাইল পথ গিয়ে জঙ্গলের প্রধান সড়কে জীপ রেখে আমরা প্রায় মাইলখানেক পায়ে হেঁটে সেই গোয়ালে এসে পৌঁছলাম। ওখানে আগে একজন ঠিকাদারের ঘর ছিল। ঘন শালের জঙ্গলের মধ্যে, প্রায় ২৫০ বর্গগজ জায়গার গাছ নির্মূল করে পরিষ্কার করা হয়েছে। তারই একপাশে শক্ত শক্ত শালের খুঁটি দিয়ে ঘেরা বাথান, আর অন্য পাশে গোয়ালাদের দুটি থাকার ঘর।

আমরা ভাবলাম যে রাতে বাঘ নিশ্চয়ই আসবে। অতএব মড়ির কাছে কোনো গাছে মাচা বেঁধে বসব। মোষের মড়িটা কোথায় আছে শুধোতে গোয়ালাদের মধ্যে একজন আমাদের নিয়ে চলল। ওদের ঘর থেকে প্রায় পচাত্তর গজ উত্তরে একটা সরু শুকনো নালা গেছে। সেই পাহাড়ি নালার এক পাশে একটা ঘন বেতের ঝোপ দেখিয়ে গোয়ালা বলল, বোধহয় এখানে রেখেছে মোষটাকে। আমরা বেত-ঝোপটাকে প্রদক্ষিণ করে ঝোপের ওপাশে গিয়ে সবে পৌঁছেছি, হঠাৎ সাত্তার গোয়ালাটাকে বলল, তুই পালা, শিগগির পালা। আমার হাতে ৩৬৬ রাইফেল ছিল, সাত্তারের হাতে বন্দুক। কিন্তু এই

সকালবেলায়, চারিদিকে ঝকঝক করা রোদের মধ্যে রাতে মারা-মোষের কাছে ভয়ের কী কারণ থাকতে পারে বুঝলাম না। সে যাই হোক গোয়ালাটি কিন্তু ততক্ষণে বড় বড় পা ফেলে চলে গেছে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখান থেকে মোষের মড়ি দেখা যাচ্ছিল না। সাত্তার ঝোপের দিকে আঙুল দেখিয়ে আমাকে ফিসফিস করেঁ কিছু বলতে যাবে, এমন সময় ঝোপের মধ্য থেকে একটা সংক্ষিপ্ত চাপা আওয়াজ শোনা গেল। আশ্চর্য কথা। বাঘ এখনো মড়ির উপরে আছে?

আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দুজনে দুদিকে সরে গিয়ে ভালো জায়গায় বেছে দাঁড়ালাম—আর প্রায় তক্ষুণি বাঘ মোষ ছেড়ে এক প্রকাণ্ড গর্জন করে এক লাফে আমাদের দিকে প্রায় উড়ে এল। সকালের রোদে থাবাতে মুখে রক্তমাখা ক্রুদ্ধ বাঘের সেই প্রলংকর মূর্তি বহুদিন মনে থাকবে। সাত্তার আর আমি বোধহয় একসঙ্গেই গুলি করেছিলাম। গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে বাঘ শূন্যে একটা ডিগবাজি খেয়ে একেবারে সটান লম্বা হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল। আমরা আশ্বস্ত হলাম যে বাঘটা সত্যিই পড়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই আমাদের ভীষণভাবে চমকে দিয়ে বাঘটা প্রায় পেটে ভর করে আমি যেদিকে দাঁড়িয়েছিলাম (নালার দিকে) সেদিকে তেড়ে এল। এখন, সেটা আমাকে শেষ আক্রমণ করার জন্যেই, কি আহত অবস্থায় নালায় আশ্রয় নেবার জন্যে, তা বুঝলাম না। তাছাড়া তখন অত বোঝাবুঝির সময়ও ছিল না। আর বেশি ঝুঁকি নেওয়া কোনো মতেই বুদ্ধির কাজ হত না—তাই বাঘের তেড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল তুলে, একেবারে বাঘের মাথা লক্ষ্য করে গুলি করলাম। অত কাছ থেকে ছোঁড়া রাইফেলের গুলি বাঘের মগজ থেঁতলে দিল সঙ্গে সঙ্গে। তারপর কতগুলো শালের চারার উপর কিছুক্ষণ থরথরিয়ে কেঁপে বাঘটা একেবারে নিশ্চল হল।

বাঘটা খুব যে একটা প্রকাণ্ড, তা ছিল না। বয়সেও একেবারে ছেলেমানুষ। সবে বড় হয়ে মাকে ছেড়ে, শিকার ধরতে আরম্ভ করেছে একা একা। সেই কারণেই হয়তো এমন বোকার মতো দিনের বেলাতেও মড়িতে বসে খাচ্ছিল আর ছেলেমানুষি করেছিল রাত্তিরে। সাত্তার বলল, 'ছোকরা হলে এত ফকরা হয় না।'

গোয়ালারা খুব খুশী হল, মোষের দুধে ফোটানো চা খাওয়াল, আমাদের খাওয়ার জন্যে জোর করে এক ভাঁড় ভয়ষা ঘি দিল। কিন্তু সেই ছেলেমানুষ সুন্দর বাঘটাকে মেরে, সত্যি বলতে কি, আমাদের একটু কষ্টই হল। ❑

দীনবন্ধু ও বাঘ্‌ডুম্বা

চল্লিশের দশকের কথা। তখন বাংলাতে ত বটেই পুরো পূর্বভারতেই মন্বন্তর। কলকাতার পথে ঘাটে মানুষ ভিক্ষা চেয়ে ভাতও নয়, একটু ফ্যান দাও মা, একটু ফ্যান দাও বলে ঘুরে ঘুরে সেটুকুও না পেয়ে ফুটপাথের উপরে মরে থাকছে। সারি সারি মরা মানুষ আর নারীর ভিড়ে পথ চলা দায়। এদিকে জাপানীরা বর্মা দখল করে নিয়ে মনিপুর সীমান্তে বর্মার তামু দিয়ে ভারতে ঢুকে আসছে। বোমাও পড়েছে কলকাতাতে। বাবা সরকারি চাকরি করতেন তাই শহর ছেড়ে যেতে পারেননি—। যাঁরা পেরেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই সাঁওতাল পরগণাতে নয়ত দেশের বাড়িতে চলে গেছেন। নিজেদের বাড়িঘর বিক্রিও করে দিয়েছেন অনেকে।

আমরা তখন রাসবিহারী অ্যাভিন্যুতে ভাড়া বাড়িতে থাকি। আমাদের কাজের ওড়িয়া লোক রত্না একদিন একটি খুব লম্বা ও রোগা কুৎসিত মানুষকে নিয়ে এল মায়ের কাছে। বলল, বৌদি, এর নাম দীনবন্ধু, এর বাড়ি ওড়িশার কালাহাণ্ডিতে। ভারি গরীব এরা। খেতে পায় না বলে কাজের সন্ধানে কলকাতাতে ওর এক আত্মীয়র কাছে চলে এসেছে। ওকে মায়না দিতে হবে না একটাকাও, দু-বেলা খেতে দিলেই হবে। যে কাজ দেবেন তাই করবে। শিখিয়ে নিলে পারবে।

আমার এক ছোট ভাই, তার বয়স হয়েছে মাত্র আড়াই বছর। দুই বোনের পরেই সে। ভাই আমার চেয়ে ন বছরের ছোট। সংসারের সব কাজ সামলে, রত্না থাকা সত্ত্বেও, মা হিমসিম খেতেন, ছোটভাইকে ভাল করে দেখতে পারতেন না। দীনবন্ধুকে ভার দেওয়া হলো তাকে দেখবার, তার সঙ্গে খেলা করবার, কান্নাকাটি করলে, তাকে ভুলিয়ে রাখবার।

দীনবন্ধুর পরনে সাজিমাটি দিয়ে কাচা একটি গেরুয়া ধুতি আর একটি চাদর। তখন গ্রামের ওড়িয়ারা সকলেই প্রায় ওরকমই পোষাক পরত। আর তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে পুরীর পিপলিতে তৈরি একটি কাচের চুমকি বসানো কাপড়ের বটুয়া থাকত। সেই বটুয়াতে ছোট কাঁচি, পান, চুন, সুপুরি আর বাড়িতে বানানো 'গুণ্ডি' থাকত। তাদের মুখ থেকে সবসময়ে পানগুণ্ডির গন্ধ বেরুত। লম্বা দীনবন্ধু আমার ভাই বুলাকে কোলে করে গল্প করত। আমি স্কুলের পড়া থামিয়ে মাথা উঁচু করে দেখতাম লম্বা দীনবন্ধুর মুখের দিকে। দীনবন্ধু অনর্গল গল্প বলে যেত ওড়িয়াতে। ভাইত বুঝতোও না। আমিও বুঝতাম না। কিন্তু তাতে দীনবন্ধুর কিছু যেত আসত না। সে ওড়িয়া ছাড়া আর কোনো ভাষাই জানত না। সে বলতো, বুলা, ও পিলা, বুঝিলু, আম্মো ঘরর সামনে গুট্টে বড্ড পাহাড় থিলা আর সে পাহাড়ে ভীষণ জঙ্গল থিলা। সেই জঙ্গল মধ্যরে পাহাড়টার নাম থিলা রেঙ্গিনা কাণি আর সেই পাহাড় মধ্যরে যে বড্ড গুহা থিলা সেই গুহা মধ্যরে গুট্টে প্রকাণ্ড বাঘ্ থিলা। সে বাঘ্টা মনুষ্য খাই থান্তি। আও যে মানুষ মানে বাঘ্র খাদ্য হইথান্তি, সে মনুষ্য ভূত হই যাইথান্তি। তাংকর নাম কন জানিচু?

বুলা চুপ করে থাকত। ওড়িশার কালাহাণ্ডির জঙ্গলে মানুষখেকো বাঘের খাদ্য হওয়া যে মানুষ ভূত হয়ে গেছে সেই ভূতের নাম আড়াই বছরের কলকাত্তীয়া শিশু জানবে কী করে। সেতো দূরস্থান, আমিই বা জানব কী করে। আমি বা আমার দুই ছোট বোন কেউই জানতাম না।

দীনবন্ধু তার কুৎসিত মুখে হাসি তুলে লাল লাল দাঁত বের করে বলত, বাঘ্‌ডুম্বা। বঝিলু বুলা পিলা?

বুলা কান্না থামিয়ে ওর বীভৎস মুখখানির দিকে তাকিয়ে থাকত।

২

দীনবন্ধু একদিন আমাদের বাড়ির সামনে ট্রাম রাস্তা পেরোতে গিয়ে বত্রিশ চাকাওয়ালা মিলিটারি ট্রাক-এর নিচে চাপা পড়ে মরে গেল। একজন আমেরিকান নিগ্রো সৈন্য সেই গাড়ি চালাচ্ছিল। সে দীনবন্ধুকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ত নয়ই, একটু দাঁড়াল না পর্যন্ত। বিরাট গাড়ি নিয়ে আরও

জোরে গাড়ি চালিয়ে সে চলে গেল। সেই সময়ে কলকাতাতে পথ চলা ভারী বিপদের ছিল আমেরিকান সাদা কালো সৈন্য আর ব্রিটিশ টমিদের বেপরোয়া ভাবে ট্রাক চালানোর কারণে। পথ চলতি দিশি মানুষদের তারা কুকুর বেড়ালের মতো মনে করত।

রত্না মায়ের কাছ থেকে একটি পোস্ট-কার্ড চেয়ে দীনবন্ধুর বাড়িতে কালাহাণ্ডিতে ওর মরে যাওয়ার খবরটি জানিয়ে দিল। শ্মশানে নিয়ে গেল রত্না আর হরি বলে পাশের বাড়ির একটি কাজের ছেলে। সেও ওড়িয়া। তার বাড়ি ছিল ঢেনকানল এ। রত্নার বাড়ি ছিল করতপটা গ্রামে—। সেই গ্রামটা কোথায় তা আমরা জানতাম না। রত্না বলত, কটক জিলাতে সে গ্রাম, পুরুণাকোর্টের কাছে।

৩

দীনবন্ধুর মৃত্যুর প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পরে আমি, আমার দুই সাহেব বন্ধুর সঙ্গে কালাহাণ্ডিতে শিকারে গেছিলাম। কালাহাণ্ডি ওড়িশার একটি জেলার নাম। দীনবন্ধুর গ্রামের নাম আমি জানতাম না, জানলেও এতদিন পরে আমার মনে থাকারও কথা ছিল না। তবে গিয়ে দেখলাম, কালাহাণ্ডিতে প্রচুর বাঘ আছে এবং সুন্দরবনের বাঘেদের মতো তাদের মধ্যে অধিকাংশই মানুষখেকো। বিরাট বিরাট কাছিমপেঠা পাহাড় সেখানে। অনেক পাহাড়ই ন্যাড়া, অদ্ভূত দেখতে। গাছ কাটার জন্যে ন্যাড়া নয়, গড়নটাই ঐরকম। সেখানে অরাটাকিরি নামের একটি গ্রামে মানুষখেকো বাঘের খোঁজে আমরা গেলে, সেখানকার মানুষেরা বলল যে, যেসব মানুষদের মানুষখেকো বাঘে মারে তারা ভূত হয়ে যায়। তারা একটি ছোট্ট পাখির রূপ ধরে বড় বড় গাছের ঝুপড়ি ডালে বসে থাকে এবং ডাকে, কিরি—কিরি—কিরি—কিরি—ধূপ্—ধূপ্—ধূপ্—ধূপ্—করে। যদি কোনো মানুষের কানে সে ডাক পৌঁছয় তবে সে সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়ে। খুব জ্বর আসে, বমি হয়, এবং কোনো ডাক্তারই তাকে বাঁচাতে পারে না। তিনদিনের মধ্যে সে মরে যায়।

এই কথা শুনে আমার দীনবন্ধুর কথা মনে পড়ল। বহুদিন আগের কথা। মনে পড়ে, মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল। ভাবছিলাম, মানুষখেকো বাঘ মারলে যদি মানুষ ভূত হয়ে যায় তবে আমেরিকান নিগ্রোর চালানো বত্রিশ চাকার ট্রাক চাপা পড়ে মরলে কী হয়? তারাও কি ভূত হয়ে যায়? আর হলে, তাদের নাম কী হয়? ❑

ফাদার-মাদারকো দোয়া

সবে তখন বনের ময়ূর-ময়ূরী জেগেছে। কেঁয়া-কেঁয়া-কেঁয়া আওয়াজ শোনা যাচ্ছে নীচের উপত্যকা থেকে। আমরা সিজুয়া হারা পাহাড়ের উপরের আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম।

রাত থাকতে বাঁশ কাটা কুলিরা এসে জড় হয়েছে পাণ্ডেজীর ভাণ্ডারের সামনে।

তাদের কারো হাতে টাঙ্গী, কারো হাতে তীর-ধনুক, কারো হাতে ফলা বসানো লাঠি। টাবড় সবাইকে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে। তারা দলবদ্ধভাবে হাঁকোয়া যেদিক থেকে শুরু হবে সেদিকে রওয়ানা হয়ে গেছে আমাদের আগে।

কিছুটা পথ পাহাড় থেকে নেমে এসে ওরা আর আমরা আলাদা আলাদা পথ নিলাম।

টাবড় আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। প্রায় মাইলখানেক হেঁটে আমরা একটা টিলার উপর একটি বিস্তীর্ণ মালভূমিতে এসে পৌঁছলাম।

মালভূমিটি প্রায় সর্বত্র সমতল। মাঝে মাঝে কোথাও কালো কালো বড় বড় পাথরের চাঁই কিংবা প্রস্তরাকীর্ণ একটু উঁচু জমি আছে। মালভূমিটার উপর দিয়ে একটি জানোয়ারদের চলা-পথ আড়াআড়িভাবে চলে গেছে। সে পথটি সামনের খাদ থেকে উঠে এসেছে।

গিয়ে মিশেছে পেছনের খাদে।

টাবড় পুব-মুখো করে আমাদের সমান্তরাল রেখায় পর পর বসিয়ে দিল প্রায় দু'শ গজ ফাঁকে ফাঁকে। হাঁকোয়া হবে পুবের খাদের পরে যে পাহাড় আছে সে পাহাড়ের উপর থেকে। অর্থাৎ পাহাড়ের উপরের এবং খাদের মধ্যের জানোয়ার তাড়িয়ে শিকারিদের সামনে দিয়ে বের করা হবে?

আমরা সব বসে গেলাম। আমি, নাজিমসাহেব, গোপাল এবং স্থানীয় আরো দুজন শিকারি।

আমাদের কারো কাছেই রাইফেল নেই। একজনের জায়গা থেকে অন্যজনকে দেখা যাচ্ছে না বটে তবে প্রত্যেকের কথা শুনতে পায় এমন দূরত্বে আছে। মাচা-টাচা বাঁধা হয়নি এবং মাটিতেই যতটুকু সম্ভব আড়াল করে বসেছি।

আমাদের বসানো সেরে টাবড় একটা অর্জুন গাছে উঠে 'কু' দিল।

উত্তরে অনেক দূরের পাহাড়ের উপর থেকে হাঁকোয়ার দলের মুখিয়া 'কু' দিয়ে জানাল যে হাঁকোয়া শুরু হল।

সূর্য তখন সবে উঠেছে। মালভূমির সমস্তটা জুড়ে সবুজ ও ফিকে লাল ঘাসে ঘাসে শিশির বিন্দুতে শিশু সূর্যের আলো চিক্‌চিক্ করছে।

চুপ করে বসে আছি। অনেক দূর থেকে হাঁকোয়ার আওয়াজ ভেসে আসছে। ক্রমশ আওয়াজ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে থাকল। উত্তেজনা বাড়তে লাগল। ময়ূর-মুরগি, হরতেল, তিতির, বটের, খরগোস, এসব ছোট পাখি ও জানোয়ার সশব্দে ও দ্রুতপদে প্রায় সকলের সামনে দিয়েই চলে গেল। কিন্তু টাবড়ের বলা ছিল যে, এসব ছোট জানোয়ার কেবল মাত্র শেষ হাঁকোয়াতেই মারা হবে, তার আগে বড় জানোয়ারের আশায় ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। দেখতে দেখতে হাঁকোয়া করনেওয়ালারা বেশ কাছে এসে গেল। হঠাৎ শুনলাম

সমস্ত মালভূমি কাঁপিয়ে প্রায় ঘোড়দৌড়ের শব্দের মত একটা মূর্তিমান ঝড় আমার বাঁ পাশ দিয়ে, নাজিমসাহেব ও আমার মধ্য দিয়ে নিমেষে বেরিয়ে গেল। সে ঝড়টা অন্য কিছুর নয়। প্রায় গোটা পঞ্চাশ বিরাজ সাইজের চিতল হরিণ মেদিনী কাঁপিয়ে, সমস্ত বনে পাহাড়ে, পাথুরে জমিতে শক্ত খুরের খটাখট্ আওয়াজ তুলে নিমেষে অন্তর্ধান করল।

আমার এবং নাজিমসাহেবের দুজনেরই পাল্লা এবং আওতার মধ্যে দিয়ে পালাল এবং আমাদের দুজনের মধ্যে যে-কেউ যদি গুলি করতাম হয়ত গুলি লাগাতে পারতাম তাহলে এক বা একাধিক হরিণ ধরাশায়ী হত। কিন্তু অত তাড়াতাড়িতে প্রথমত কোন্‌টা পুরুষ হরিণ তা ঠাহর করা মুশকিল ছিল, দ্বিতীয়ত কুল ও কেলাউন্দা ঝোপের মাঝে মাঝে ধাবমান হরিণগুলোকে যতটুকু দেখা যাচ্ছিল, তাতে একেবারে আন্দাজে গুলি করাতে হত। তাছাড়া ঐ সবুজ পটভূমিতে সোনালী হলুদ এবং কালো হঠাৎ ঝড়ের দৃশ্যে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে, সে কথাও সত্যি। যে কারণেই হোক, না-নাজিমসাহেব না আমি গুলি করলাম ; আর হরিণগুলো খটাখট্ করে আমাদের পেছনের খাদে নেমে গেল। হরিণের দলটা দেখার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ডানদিক থেকে একটা গুলির আওয়াজ পেলাম।

ততক্ষণে হাঁকোয়াওয়ালারা প্রায় আমাদের কাছাকাছি চলে এসেছে।

হাঁকোয়াওয়ালারা আসতেই আমরা সবাই ডানদিকে যেখান থেকে গুলির আওয়াজ এসেছে সেদিকে এগিয়ে গেলাম। যেখান থেকে আওয়াজ এল, সেখানে বসেছিলেন চাতরার নফর আলি। নফর আলির কাছে যেতেই দেখি মুখ গম্ভীর। একটা শিশুগাছের তলায় দাঁড়িয়ে মাটিতে কি যেন দেখছেন মনোনিবেশ করে।

ব্যাপার কি? জিজ্ঞেস করাতে বললেন যে, একটা প্রকাণ্ড চিতা বাঘ তার সামনে দিয়ে যে নালাটা চলে গেছে সেই নালার মধ্যে দিয়ে দ্রুত পদে তাঁর ডাইনে থেকে বাঁয়ে যাচ্ছিল। তার মানে হাঁকোয়াওয়ালাদের তাড়া খেয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল নিরাপদ আশ্রয়ে। তাঁর বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আসা মাত্র নফর আলি নিশানা নিয়ে তাঁর একনলা বন্দুক দেগে দিয়েছেন। বন্দুক দাগ্‌বার সঙ্গে সঙ্গে চিতাটা ছিলাভাঙা ধনুকের মত সোজা ছিট্‌কে উপরে উঠে এই শিশুগাছের তলায় একেবারে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েই পরমুহূর্তে আর এক লাফে তাঁর বাঁ পাশের কুল কেলাউন্দা ও পিটীসের ঝোপে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নফর আলি দুঃখ করলেন তাঁর দোনলা বন্দুক নেই বলে। দোনলা থাকলে

তিনি আর একটা গুলি করার সুযোগ নিশ্চয়ই পেতেন।

শিশুগাছের তলায় সবাই মিলে ভালো করে দেখলাম। কিন্তু রক্ত দেখা গেল না। দ্বিতীয়বার লাফ দিয়ে গিয়ে যেখানে পড়েছে সেখানে রক্ত থাকতে পারে হয়ত। গুলি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠেছিল যখন অত জোরে, তখন গুলি নিশ্চয়ই লেগেছে।

আহত চিতাবাঘ খুঁজে বের করে মারার চেষ্টা আত্মহত্যারই শামিল। আমরা নফর আলি সাহেবকে বললাম, আপনি এখানেই থাকুন, কারণ আপনার একনলা বন্দুক নিয়ে আবার বিপদে পড়তে পারেন।

নফর আলিকে ওখানেই রেখে ও হাঁকোয়াওয়ালাদের ওখানে অপেক্ষা করতে বলে সেই ঝোপের দিকে গোপাল, আমি ও নাজিমসাহেব এগিয়ে গেলাম।

আল্লা, বিস্‌মিল্লা ইত্যাদি কী সব স্বগতোক্তি করলেন চাপা গলায় নাজিমসাহেব।

খুব সাবধানে বন্দুকে গুলি পুরে ঝোপে ঢুকতেই দেখলাম একটা কেলাউন্দা গাছের পাতায়, মাটি থেকে হাতখানেক উঁচুতে অনেকখানি টাটকা রক্ত লেগে আছে। অতএব বুঝতে বাকি রইল না যে গুলিটা লেগেছে বাঘের গায়ে। রক্তর ছটা যেদিকে গেছে সেদিকে ঝোপঝাড় থাকা ছাড়া আর বিশেষ কোনো অসুবিধা ছিলো না। জমি প্রায় সমতলই ছিলো পাহাড়ের উপর। অতি সন্তর্পণে আমরা তিনজন অধচন্দ্রাকারে এগোচ্ছি।—বন্দুক প্রস্তুত করে নিয়েছি এবং ঘোড়ার উপর আঙুল ছুঁইয়ে রেখেছি।

প্রায় হাত পঁচিশেক এগিয়ে যেতেই আবার দেখা গেল রক্তের চিহ্ন। নালার দিকে চলে গেছে। সেখানে বাঘকে খুঁজতে যাওয়ার উত্তেজনাময় মুহূর্ত সব শিকারিরই কাম্য।

সেই নালার কাছে যাবার আগে নাজিমসাহেব আমাদের প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াতে বলে একটা পাথর ছুঁড়ে মারলেন নালার মধ্যে। আমার আর গোপালের মনে হল একটা অত্যন্ত চাপা ও ক্ষণস্থায়ী গর্জনের মতো শুনতে পেলাম ডান দিকের একটি অসমতল জঙ্গলাকীর্ণ নালা থেকে। নাজিমসাহেব ইসারায় বলতে, উনি বললেন, নহী নহী কুছ্ নহী আইয়ে ইসতরফ্‌সে উতরাইয়ে নাল্লিমে—বলে, আমাদের পথ দেখিয়ে আমরা যে জায়গায় দাঁড়িয়েছিলাম তার থেকে হাত পঁচিশেক দূরে ডানদিকে নিয়ে এলেন। সেখানে নালাটা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার।

নাজিমসাহেব নালায় নাবছেন। ঢালু পাড়ের প্রায় অর্ধেকটা নেমে গেছেন, এমন সময় ঝোপঝাড় ভেঙে নালার শুক্‌নো তটরেখা বেয়ে চিতাটা বিদ্যুৎগতিতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো নাজিমসাহেবের উপর কিন্তু ভগবানের করুণাতে সেই মুহূর্তেই নাজিমসাহেব পা হড়কে একেবারে অনেকখানি নীচে চলে যাওয়াতে চিতাটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে নালার পাড়ের কাঁটাঝোপ আর পাথরে ধাক্কা খেয়ে নালার মধ্যেই পড়ে গেল।

সে এক অকল্পনীয় অবস্থা।

নালার মধ্যে নাজিবসাহেব মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছেন এবং তাড়াতাড়ি করে যতই ওঠবার চেষ্টা করছেন ততই আরো পাথরে তাঁর স্ব-নির্মিত টায়ারসোলের জুতো পিছ্‌লে যাচ্ছে আর ওদিকে হাত দশেক দূরে গুলি খাওয়া চিতা।

আমি আর গোপাল প্রায় পাশাপাশিই দাঁড়িয়েছিলাম।

প্রথমটা আমরা একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম—চিতার ঐ প্রচণ্ড গর্জন আর জিঘাংসু চাউনি এবং তার উপর নাজিমসাহেবের অধঃপতন-এ দুইয়ে মিলে আমাদের বেশ কিছুটা চম্‌কে দিয়েছিল। কিন্তু আর বিন্দুমাত্রও বিলম্ব না করে আমরা দুজনে প্রায় একই সঙ্গে বন্দুক তুলে গুলি করলাম চিতাকে। যে অবস্থায় ওটা পড়ে ছিল সে অবস্থাতেই রইল, কেবল মাংসপেশীগুলো কাঁপতে লাগল থর্‌থর্‌ করে।

ততক্ষণে পুনর্জন্ম লাভ করে এবং প্রচুর চেষ্টা করে অধঃপতিত অবস্থা থেকে উন্নত হয়ে নাজিমসাহেব আমাদের দিকে তাকালেন। এবং তার মুখের সদ্য মৃত্যুভয়-মুক্ত একটা অপ্রস্তুত অভিব্যক্তি দেখে আমরা হেসে ফেললাম।

নাজিমসাহেব বিড়বিড় করে আমাদের বকতে বকতে পাড়ে উঠলেন। বললেন, কেয়া লড়প্পন্‌ বাজী কর রহা হ্যায় আপলোগোঁনে?

ফাদার-মাদার কো দোয়া থা, উসীসে আজ বাঁচ গ্যয়া। ❑